W. B./BKU—6

"সত্যং পরং ধীমহি"

জাগরণের যুগ,

শাশ্বত ভারত

এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ,
এ যুগ মহামুক্তির যুগ।"
—এ যুগের ঋষিমন্ত্র

সম্পাদক—শ্রীসুবলীধর সরকার
৭ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা—বার্ষিক চার টাকা
Apr - May 1976

শাশ্বত ভারত" কি ?

শাশ্বত" কথার অর্থ—চিরগতিশীল, চিরপ্রগতিশীল। "শশ্বৎ" থেকে যার অর্থ শশ বা খরগোসের মতো ক্রমাগত চলতে থাকা বা এগিয়ে যাওয়া। অবিচল নিয়মে ও সত্যে চিরনূতন তাই 'শাশ্বত'। সুতরাং "শাশ্বত ভারত" কালের অচল অনড় একই রকমের ভারত নয়।

★ ★ ★ ★

স্থায়ী নিয়ম বা সত্য হচ্ছে—"নেতি নেতি আত্মা"। কেই—সকল সচেতন গুণক্রিয়াকেই—'নাই' বা 'নয়' করে তাই হচ্ছে "আত্মা"। এই আত্মার মধ্যেই ঈশ্বর, ব্রহ্ম, ভক্তি, মুক্তি ; উন্নতি, অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স সব কিছু। ত্যাগের শক্তি, সংযমের শক্তি, সত্যের শক্তি। এতেই ম ও প্রভুত্বকামের সামাজিক ও স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ। এতেই নের নিত্যমুক্তি বা মহামুক্তি। মধ্যযুগের প্রতিক্রিয়ামূলক ী বৈরাগ্য, শান্তি বা আনন্দ এর মধ্যে অর্থহীন। দিক জীবনবাদ।

★ ★ ★ ★

দিক জীবনবাদে কোনও মতবাদ বা সম্প্রদায়বাদ বা **গুরুবাদ বা অবতারবাদ নেই**। এতে সকল জাতির, সকল দেশের, সকল ভাবের এক মহামিলন—এবং অধঃপতিত সভ্যতার সঙ্কটে হাজাগরণ ঘটবে।

—০—

শাশ্বত ভারত কি চায় ?

আমাদের পত্রিকাটি গত ছ'বছরের মধ্য দিয়ে দেশের বহু শ্রেণীর বহু মানুষের মনে একটা রেখাপাত করেছে। এর মধ্যে নানা স্তরের চিন্তাশীল মানুষের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কেউ কেউ ও করেছেন (অথবা করতে চেয়েছেন) যে **"শাশ্বত ভারত"** কি চায়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা আগে-আগেও কিছু বলেছি বা ঘোষণা দিয়েছি। কিন্তু আমরা বা আমাদের চিন্তানায়ক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সত্যসাধক ব্রহ্মচারীর যা লক্ষ্য তা অত্যন্ত পরোক্ষভাবে নানা সমসাময়িক আলোচনার মধ্য দিয়েই আমরা প্রকাশ করি। কারণ দেশ-জাতি-সমাজ-বিশ্বের উপর একটা মতবাদের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের ধর্ম্ম স্বভাবধর্ম্ম বা স্বাভাবিক জীবনের ধর্ম্ম। আমরা দৃঢ়ভাবে এবং অবিকল নিষ্ঠায় বিশ্বাস করি যে "এযুগ মহাজাগরণের, মহামিলনের, মহাসমন্বয়ের, মহামুক্তির যুগ"। এযুগের এই ঋষিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত এবং **মহাসত্য পরম দেবতার 'কৃপা'-প্রেরিত** হয়েই আমাদের মধ্যে **আমাদের অন্তরদেবতা শ্রীমৎ সত্যসাধক ব্রহ্মচারী** আজীবন নিরবিচ্ছিন্ন, সাধনা তপস্যা ও আত্মপ্রকাশ করে চলেছেন। মহাসত্যের মহানিয়মে এযুগের মহাজাগরণের একটা বিশেষ ধারা তাঁর মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে চলেছে। সে ধারা এযুগের পুঞ্জীভূত মানসিক ও বৌদ্ধিক জটিলতা এবং জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে পূর্ব-পূর্ব যুগের আদর্শ ও নীতির নামে ভ্রান্ত ধারণা ও গতানুগতিক সংস্কার থেকে মুক্তির ধারা। এযুগ ধর্ম্মীয় চিন্তা ও ভাবের রাজ্যেও এক মহা-বিপ্লবের যুগ,—অর্থাৎ এক আমূল পরিবর্ত্তনের যুগ। বৈদিক "সহজ" জীবনে ফিরে যাবার যুগ। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আজ Frustration বা ব্যর্থতার হাহাকার চাপা রয়েছে। তারই

[redacted]পরে [redacted] ভাবের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই এ পথে আর [redacted]। সেজন্যই ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি, সমাজনীতি রাজনীতি, অর্থনীতি, গৃহনীতি, কামনীতি, ভোগনীতি, ত্যাগনীতি, শিক্ষানীতি, দীক্ষানীতি শান্তিনীতি, মুক্তিনীতি, বিজ্ঞাননীতি সর্বক্ষেত্রেই আজ ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত জঞ্জাল। মানুষের চেতনাই আজ উল্টে গেছে। কুটিলতা, চালাকি, ডিপ্লোম্যাসি, আতঙ্ক, সংশয়, সন্দেহ এবং তার ফাঁকে ফাঁকে ত্যাগের বা শান্তির, সার্থকতা বা শক্তির নানা [redacted] আবেগ ও উদ্দাম প্রচেষ্টাই আজ সব কিছু।

চেতনার এই চরম ও ব্যাপক জড়তাকে ভাঙবার জন্যে প্রকৃতি আজ সক্রিয়। সব কিছু ব্যর্থতার এক মহাপ্রাকৃতিক সার্থকতা আনার এই যুগ-অন্দোলনে তাল মিলিয়ে চলাই আজ জীবনসাধনা ও জীবন-সিদ্ধির পথ। এর জন্যে সর্বক্ষেত্রে চাই এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী।

কি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী? সংক্ষেপে বলা যায়, এ হচ্ছে জীবনের ও জগতের মূল রহস্যশক্তি যে নিত্যসক্রিয় পরমবাস্তব মহাশূন্যতা বা মহানির্গুণতা—তাকে ধরে বা তদভিমুখে সর্বদা ও সর্বথা চলা। জীবন তখন নিত্যকালের সহজ সংযমে, সহজ শক্তিতে, সহজ সমাধানে ও সহজ মুক্তিতে ভরে উঠতে থাকে। অথচ এতেই সুখ-শান্তি-ভুক্তি-মুক্তি লাভের নিত্যচেষ্টা ও নিত্যমুক্তির নানা স্বচ্ছন্দ লীলা। বৃহদারণ্যকের "নেতি নেতি আত্মা" এবং তৈত্তিরীয়ের "অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো সৎ অজায়ত, তৎ আত্মানম্ স্বয়ম্ অকুরুত, তস্মাৎ তৎ সুকৃতম্ উচ্যতে। যৎ বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সঃ, রসং হি এবায়ম্ লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"—এর মধ্যে রয়েছে এই নূতন গতির জীবনদর্শন। আরও গভীরে রয়েছে আরও পূর্বের ঋষিদের নাসদীয় সূক্ত [redacted] সূক্তের প্রেরণা।

তথাকথিত দুঃখমুক্তি, মৃত্যুমুক্তি, অজ্ঞানমুক্তি এখানে লক্ষ্য নয়, পরমা মহাপ্রকৃতির যুগবিধানে দুঃখ-মৃত্যু-অজ্ঞানের সঙ্গে সুখ-জীবন-জ্ঞানের সংযোগ ও সমন্বয়-সাধনই এর লক্ষ্য। এই হ'লো মহামুক্তি। আর এ মুক্তি এমন এক মহাজীবনকে নিয়ে যে প্রতিক্রিয়ামূলক বিরাগের পরিবর্তে এখানে আছে এক অনুক্রিয়ামূলক অনুরাগ। এরই জন্যে এ হচ্ছে এক স্বভাবকর্ম্মের সহজধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক। ব্যক্তি ও সমাজ, ইহকাল ও পরকাল, পাপ ও পুণ্য, জগৎ ও ঈশ্বর, ভোগ ও ত্যাগ স্বার্থ ও পরার্থ, অহংচেতনা ও প্রকৃতিচেতনা এখানে একই সূত্রে গ্রথিত, একই মুদ্রার এপিট-ওপিট। এই স্বভাবজীবনে আছে সমাজজীবনের ও সমাজচরিত্রের সব কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিষ—যা' এযুগের একান্ত কাম্য ও সর্বনিয়ন্ত্রী মহাপ্রকৃতির অভিপ্রেত।

এ ধর্ম্মে প্রচলিত কোনও ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে বিরোধ নেই। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধনার মধ্যে যে একটী স-বা উনতা এযুগে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে—সেই অভ পূরণ করাই এর কাজ। এটী সকল ধর্ম্মের ও ধর্ম্মসাধনার অনুপূরক—যার অভাবে সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতই আজ বহু ব্যাপক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এইখানেই এর অসাধ

এরই জন্যে সকল ধর্ম্মমতের সাধকেরা বা অনুগামী অনুপূরক যুগধর্ম্মের অংশীদার হতে পারেন। আর শুধু তাঁদের হতেই হবে, কারণ এ এক যুগপ্রকৃতির চাহিদা ও এ ধর্ম্মে সেজন্য ঈশ্বরবাদ, পরমাত্মাবাদ, জ্ঞানবাদ, ভক্তি মহাপুরুষবাদ, শান্তিবাদ, মুক্তিবাদ, জড়বাদ, ভোগবা ত্যাগবাদ ইত্যাদির প্রশ্ন প্রধান বা বড় নয়। এক *Pristine* বা আদি সহজ জীবনের সাধনায় ফিরে যাওয়াই এর প্রধান

এরই জন্যে বর্ত্তমান যুগ-জটিলতার সব কিছু সমস্যা ও সহজ সমাধানই এর কাম্য। এজন্যই আধুনিক জীবনের কোনও সমস্যাকেই আমরা এড়িয়ে যাই না ভাবুকতার ও চিন্তাবিলাসের আবরণে ঢেকে দিই না। উদা যায়, যৌনকামজীবনের সত্য রহস্যকে আমরা উদ্‌ঘাটিত করে সহজ স্বাভাবিক পথ দেখিয়ে দিই, প্রেমভালোবাসার সহায়তা করি, আবার এ সব কিছুকে সহজভাবে ছেড়ে মহা নিত্যজীবনে প্রবেশের প্রেরণাও উদ্বোধিত করি। কমি দার্শনিক তত্ত্ব Negation of Negation কে আমরা নিত্যশূন্যের সক্রিয়তার মহাতত্ত্বে তুলে ধরি এবং ভাবী যু রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে মহা-ভারতের এক মহাসমন্বয়-সাধ করি। জনবিস্ফোরণের যুগে কৃত্রিম গর্ভনিরোধ বা ভ্রূণবি প্রয়োগের সঙ্গেই যৌনসংযমের স্বাভাবিকতা; সম্ভাব্যতা ও কোথায় তা প্রতিপন্ন করি। ডিপ্লোম্যাসির যুগেই ঋজু দ্বারোদঘাটন করার যোগকৌশল দেখিয়ে দিই। অথ মধ্য দিয়ে আমরা আধুনিক যুগ-বিভ্রান্ত মানুষকে একটা সমন্বয়ের ও সমাধানের পথ দেখিয়ে দিই। এর জন্যে সমস্ত ও সম্প্রদায়-সাধনারও ভুলের দিকটা আমাদের দেখিয়ে আর এইভাবে এই চরম যুগসংকটে যে শাশ্বত অর্থাৎ চিরনূতন মানবতার বাস্তব সামাজসাধনা ভারতের অ সমাজধর্ম্মের প্রচারই আমরা করে চলেছি। আমাদের পরাজয় নেই, তাড়াহুড়ো নেই,—কারণ আমরা মহাপ্র হয়ে স্বভাবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। *

* আমাদের এই নূতন যুগদর্শনকে বিশদভাবে বুঝতে গেলে আমাদের "অমৃতের পথে" ইত্যাদি যুগগ্রন্থ ও পুস্তিকাদি পড়া দরকার।

 Pub-HO528b-1-P36177

ই সেই দেশ যে দেশ এই যুগবিভ্রান্ত জগৎকে এবার
তার পথে নিয়ে যাবে। এরই জন্যে সর্বাগ্রে ভারতের
গের অভিপ্রেতভাবে মহাপ্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে গড়ে তোলাই
প্রধান কাজ। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিই যুগে যুগে
য়োজনমত ভাঙতে ও গড়তে পারে। নিজের উপরেও
আসক্তির বন্ধন নেই। সেই জন্যেই বিশ্বজগতের সমস্ত
তে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করে, নানা পরিবর্তন সাধন করেছে।
ারতের মূল ধারা হারিয়ে যায় নি। আজ সব কিছু
করে হজম করে ভারতের নিজস্ব সত্বাকে জগতের সামনে
ত হবে। তারই জন্যে একনূতন মানুষের নূতন ভারতীয়
তে হবে। আর তাই হবে **বিশ্বভারত**। সেই নূতন
সমাজ গড়াই আমাদের লক্ষ্য। আর এই উদ্দেশ্যেই
ধীরে ভারতীয় জাতীয়জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভুলকে
ক্ত পথের নিশানা দিয়ে চলেছি।

ইন্দিরাজীর পদযাত্রা

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর প্রেরণা ও পরিকল্পনামত
কে বিভিন্ন প্রদেশের বিধানসভা-সদস্যেরা পর্যন্ত
নকেই গ্রামাঞ্চলে পদযাত্রা করলেন। গ্রামবাসীর সঙ্গে
খের কথা বল্লেন, কুড়ি-দফা কর্মসূচীর সার্থকতা বুঝালেন।
ন না হলেও প্রশাসন-পর্যায়ে নূতন একটা ধাপ অবশ্যই
র ডাণ্ডি-মার্চ অথবা নোয়াখালি-সফর, কিম্বা ভূদান-ঋষি
গনযজ্ঞে পর্যটন নূতন কথা নয়। কিন্তু এই ভারতীয়
কটীকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োগের কৃতিত্ব অবিসম্বাদীরূপে
বিশেষে তাঁর—নিজের এলাকায় গ্রামে গ্রামে যেভাবে
দুয়ারে দুয়ারে আন্তরিকতার সঙ্গে ঘুরেছেন তা'
দাবী রাখে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তাঁর
ন্ত্রীরাও সমান উৎসাহ দেখিয়েছেন।

নির্যাতিত, দরিদ্রের প্রতি—এক কথায় কমন ম্যানের
ভূতিই এ যুগের বিশ্বরাজনীতির চাবিকাঠি। সে দিক
জবাদ, গণতন্ত্র, গরীবী-হটাও নীতিগুলিকে প্রশাসন-যন্ত্রের
মানুষের হৃদয়াসনেও নামিয়ে আনা এক খুব প্রশংসনীয়
এই প্রোগ্রামটীকে সত্যিকার স্থায়ী সার্থকতা দিতে
গণের ও গ্রামবাসীর হৃদয়বৃত্তীকেও বুঝা চাই।

সেখানে রয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"বিশালাক্ষীর দ" অর্থাৎ কিনা
পাঁকে পরিপূর্ণ হ্রদ—সেখানে যেই নামবে সেই ডুবে মরবে। গ্রামীন
জীবনের চারিত্রিক সুস্থতার পুনরুদ্ধার একই সঙ্গে করতে পারলেই
আমাদের কুড়িদফা অর্থ-নৈতিক কর্মসূচী সার্থক হয়ে উঠবে। এই
বাস্তব সত্যটা অবশ্যই এই নূতন জাতিগঠনের প্রাক্কালে মনে রাখতে
হবে। তার জন্যে দেশব্যাপী এক নূতন সাংস্কৃতিক আন্দোলনও শুরু
করতে হবে।

মহেশযোগীর অতীন্দ্রিয় মেডিটেশান

শ্রীমৎ মহেশযোগী ভারতে কিছু ইংরেজ বীট্‌লদের সহায়তায়
এক অতীন্দ্রিয় ধ্যানের কেন্দ্র খুলেছিলেন। উদ্দেশ্য (যতদূর জানা যায়)
প্রত্যেককে তার সংস্কার-অনুযায়ী একটা 'সাউণ্ড' বা শব্দবীজ দি
মনকে একাগ্র করতে, মনের দ্বন্দ্ব দূর করতে, এবং সফলতা (su
ও প্রশান্তি লাভ করতে সহায়তা করা। উদ্দেশ্য সৎ এবং এ যুগে
উপযোগী এতে সন্দেহ নেই। এর জন্যে আমেরিকায় প্রচুর সরকারী
ডলারও তিনি পাচ্ছেন—ছাত্রদের মানসিক ইনটিগ্রেশানের কাজে।
প্রাইভেট সিটিজেনদের কাছে,—যেমন ফিল্মষ্টার, শিল্পী, ব্যবসায়ী,
প্রশাসক ইত্যাদির কাছেও নিশ্চয় এর আবেদন প্রচুর। ক্রীশ্চান
মিশনারীরা তো খাপ্পা হয়ে উঠেছেন—'হিন্দু' ধর্মের পিছনে এই সরকারী
ডলারের অপচয়ে।

যাই হোক, আমাদের বলার এই যে শ্রীমহেশজীর অতীন্দ্রিয়
সাউণ্ড-ধ্যানের সাধনায় কিছু তান্ত্রিক ধারার বৈজ্ঞানিকতা থাকতে পারে,
কিন্তু এই সব তাক-তুক ভারতীয় ধর্মের মূল বিষয় নয়। সাবেকের
সেই স্বামী বিবেকানন্দের আমল থেকে বিদেশে 'হিন্দু' ধর্ম প্রচার
অনেকটা ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক ও রহস্যবাদী
ধারাতেই হয়ে চলেছে। এতে রোমাঞ্চ নিশ্চয় আছে, প্রকারান্তরে
'হিন্দু' ধর্মের এতে কতকটা বিদেশী আদরও বাড়ে। কিন্তু এতে
ভারতের বা জগতের কোনও স্থায়ী কার্যকরী কল্যাণ হয় না, সত্যিকার
ভারতধর্মেরও প্রসার ঘটে না। যোগদা সৎসঙ্গের প্রাণায়াম ইত্যাদির
প্রচার, কৃষ্ণচেতনা সমিতির রথটানা ও সংকীর্তন, বালযোগেশ্বরের
প্রেমধর্ম প্রসারের কৌশল—এ সবই ভারতীয় ধর্মের এক একটা রকেটের

মতো বিদেশী মানুষকে কল্পনার চন্দ্রলোকে নিয়ে যায় মাত্র—যে চন্দ্রলোকে প্রাণের অস্তিত্ব নেই—থাকতেও পারে না। কারণ ভারতের শাশ্বত ধর্ম একটা অসাম্প্রদায়িক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, মধ্যযুগীয় গুরুবাদমুক্ত নূতন মানুষের নূতন সমাজ ও সুস্থ সমাজচরিত্র গড়ার ধর্ম। আজ স্বাধীন ভারতকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যে এর লুপ্ত বাস্তববাদী ও বৈজ্ঞানিক সমাজধর্মকে উদ্ধার করতে হবে।

শ্রীসঞ্জয় গান্ধী ও শ্রীমতী অম্বিকা সোনী

এই দুই যুবনেতা ও যুবনেত্রী ভারতের যুব-আন্দোলনে একটা বাস্তব ও শক্তিশালী সংহতির প্রেরণা যোগাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুনরুজ্জীবনের কুড়ি-দফা কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য এই সংহতি একান্ত প্রয়োজন। লক্ষণীয় যে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর মতো প্রাক্তন যুবনেতারাও প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচীকে স্বীকার করে চলেছেন। কিন্তু ...র প্রশ্ন সেখানে নয়; আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশদফা কর্মসূচীকে ধরে এই যুব-আন্দোলন কেমন করে সত্যিই জাতীয় জাগরণের সহায়তা করতে পারে। এঁরা যে কয়েকটী কর্মসূচী নিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে পণপ্রথা তুলে দেওয়া, পরিবার পরিকল্পনার সহায়তা, বৃক্ষসম্পদ বাড়ানো, দরিদ্র জনগণের পাশে দাঁড়ানো, এক-একটা বিশেষ অঞ্চলে দারিদ্র্য হঠানো ইত্যাদি। কাজগুলি প্রশংসনীয় এবং কুড়ি দফা কর্মসূচীর বিশেষ সহায়ক সন্দেহ নেই। যুবশক্তি এখন থেকে হিংসা-মারামারির পরিবর্তে বাস্তব সমাজগঠনের কার্যকরী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন। নূতন অর্থ-নৈতিক ভারত গড়তেও নূতন সমাজ চাইই চাই। মনে রাখতে হবে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণও তাঁর ভুল রাজনৈতিক কর্মধারা নিয়েও বলেছিলেন—'সমাজকো বদলনা হ্যায়', অর্থাৎ 'নূতন সমাজ গড়ো'। এর জন্যে অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদ করতেও তিনি যুবসমাজকে অগ্রণী হতে বলেছিলেন। কিন্তু সমাজকে বদলে একটা নূতন সমাজ গড়তে হ'লে চাই এক নূতন সমাজদর্শন, যেটার তাঁর অভাব ছিল, একথা তখনই আমরা বলেছিলাম। কমিউনিষ্টদের মধ্যে এটা আছে—মার্কসবাদরূপে। গান্ধীজীর দর্শনে সেরূপ শক্তিশালী নূতন দর্শন আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। নচেৎ শ্রী সঞ্জয় গান্ধী ও শ্রীমতী অম্বিকা সোনীর এতখানি উৎসাহের গোড়ায় ফাঁক থেকে যাবে। লক্ষ্য করতে হবে যে শ্রীমতী গান্ধীর অনুসরণে শ্রীমান সঞ্জয় ও শ্রীমতী অম্বিকাও সব সময় বলেন, এই সব কাজ আমরা যেন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বজায় শ্রীমান্ সঞ্জয় একবার কয়েকটা উদাহরণও দিয়েছিলেন যৌগিক পন্থার বিদেশে সমাদর, আয়ুর্বেদের মূল্য ই বাহুল্য এগুলি খুব ফিকে উদাহরণ। আসলে আমরা বলেছি—ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার বাস্ত ধারণা নিয়ে তাকে বর্তমান যুগের অযোজনের সঙ্গে হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঠিক এই জিনিষটাই চাইছে এই নবজাগরণের দিনে এইটেই প্রয়োজন। কিন্তু স্বীক এরূপ বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা বা চিন্তাধারা ি আমাদের পুস্তক-পত্রিকা-আলোচনা-ভাষণাদির মধ্ অভাবটাই পূরণ করতে চাইছি।

রামায়ণের নব মূল্য

জাতীয় আচার্য বিশ্ববিখ্যাত বিদগ্ধ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতি-উক্তিতে—রামায়ণের নূতন মূল্যায়নের দরজা খুলে গেছে রামচন্দ্রের ভগ্নী, রামায়ণের কাহিনী নাকি বৌদ্ধ দশরথ-জাত বাল্মীকি নাকি এর লেখক নন, এতে নাকি গ্রীক মহাক প্রভাব আছে ইত্যাদি। এতে পণ্ডিতসমাজে নানা ও করেছে—সপক্ষ, বিপক্ষ ও নিরপেক্ষ সব রকম। আমরা এই মধ্যে না গিয়েও প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি কথা বলতে পারি য বলে ধরা যেতে পারে।

১। জাতীয় জীবনে রামায়ণ-কাহিনীর আধ্যাত্মিক মহামূল্য কেউ অস্বীকার করেন না, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় তিনি একথা বলেছেনও। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস এক কথা এ অথবা বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক বাস্তবদৃষ্টি আলাদা কং মনে রাখতে হবে, রামচরিতমানস-রচয়িতা মহাত্মা তু শ্রীসুনীতিকুমার তাঁর 'ভারত-সংস্কৃতি' পুস্তকে লিখেছেন—' ভারতের সবচেয়ে বড় জনপ্রিয় কবি। .....প্রাচীন ভার চিন্তা আর আদর্শকে তুলসী মধ্যযুগের ভক্তিরসে সিক্ত দিয়েছেন'।'

২। ভারতের শাশ্বত ধর্মই একমাত্র ধর্ম যাতে প্রচুর স্বাধীনতার স্কোপ রয়েছে। যুগে যুগে ভারতধর্ম নিজে

ছে গড়েছে, আবার খাপ খাইয়েছে। ধর্মীয় ভাবপ্রবণতার খুঁৎখুঁতেমি ভারতের ধর্মে স্থান পায় নাই। এ সব মধ্যযুগীয় ভারতের সুপ্রাচীন শাশ্বত ধর্মের সঙ্গে সদৃশ নয়। প্রচলিত দৃষ্টিতে ভালই হোক আর মন্দই হোক, ভারতধর্ম এক স্বতঃপ্রকাশ Naturalism-এর ধর্ম। সব কিছু রূঢ় বাস্তবকে বে গ্রহণ করতে পারে।

শ্রীরামচন্দ্রের ভগ্নী কি না আমরা জানি না, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে গভীর প্রণয়তার exclude করার কোনও কারণ আছে কি? বেদের মধ্যে যমীর) কাহিনীটি তা' হলে এত স্বীকৃত হ'ল কি করে? এখনও সময় যম ও যমুনার কথা একসঙ্গে মন্ত্রে স্মরণ করা হয়। মায়ণকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রূপকরূপে গ্রহণ করলে তো কারণ, রূপকদৃষ্টিতে ব্রহ্মার নিজের মধ্য থেকে সৃষ্টা কন্যাস্থানীয়ার আকর্ষণের বর্ণনা তো শ্রেষ্ঠ উপনিষদের মধ্যেই রয়েছে। রূপকদৃষ্টিতে তা' গভীর অর্থপূর্ণ।

ন-মহাভারত ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা চিরন্তন স্তম্ভ ক্তি হয় না। আমাদের 'অমৃতের পথে'-নামক বিশিষ্ট গ্রন্থে মায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনীর ভ্রান্ত কদর্থ দূর ব্যাখ্যা দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় জাতির য়ণের যুগযুগব্যাপী মহামূল্যকে স্বীকার করে তার সামনে করতে চেয়েছেন—একথাও আমরা উদ্ধৃত করেছি। রা একথাও বলেছি যে বর্ত্তমানে রামায়ণ-মহাভারতের স্তব নৈতিক প্রভাব জাতীয় জীবনে নেই ব'ল্লেই চলে। ারতধর্মের সত্যিকার স্বরূপ বুঝে নিয়ে আজ নূতন ত গড়তে হলে রামায়ণ-মহাভারতেরও নূতন বাস্তব রকার — যে মূল্যায়ন কোনও সমস্যাকেই এড়িয়ে যাবে াখতে হবে ভারতধর্ম, আমাদের মতে, খুবই বাস্তবধর্মী, ভাবুকতার ধার ধারে না এবং বিপুল দুর্জ্জয় সাহসে নিজেকে নিজেই ভেঙেছে ও গড়েছে, নূতন নূতন রূপে। শাশ্বত ভারতধর্মের অমরত্বের চাবিকাঠি রয়েছে। সুতরাং তবাবুর সাহসী আলোচনায় ভারতধর্মের অঙ্গহানি ঘটবার াই নেই। হয়ত বা শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনাই রয়েছে।

চন্দ্রের অবতারত্ব অনেক পরে রামায়ণে প্রক্ষেপ করা বিষ্ণুর অবতার তিনি নন—এই কথাটি আমাদের টী টেক্‌নিক্যাল গুরুত্বই পেয়েছে মাত্র। আসলে বৈদিক ভারতধর্মে মধ্যযুগীয় অবতারবাদের বিশেষ স্থান আছে বলেই আমাদের মনে হয় না এবং বর্ত্তমান ভারতে যুগপৎ অনেকগুলি অবতারের আবির্ভাব সত্ত্বেও ভারতের সমাজ জীবনে জাতীয় চরিত্র-ধর্মের একান্ত অভাব কোন অবতার আগে না পরে স্বীকৃত—একথাটীকে খুবই গৌণ করে তোলে।

জাতীয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমরা যতদূর জেনেছি— তিনি সুদীর্ঘ জীবনের জ্ঞানচর্চ্চায় এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় এক অজ্ঞেয়বাদের সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। আমাদের কাছে তিনি প্রসঙ্গান্তরে যে পত্রাদি লিখেছেন তা' থেকেই আমরা এ কথা বলছি। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতবাদের সঙ্গে আমাদের মতবাদের কতটা মিল হতে পারে আমরা জানি না, কিন্তু তাঁর বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন অজ্ঞেয়বাদের মধ্যে এ যুগের উপযোগী সত্যচিন্তার সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ওঁকারনাথ ঠাকুর তাঁকে কতকগুলি সুলভ বৈরাগ্য-উদ্দীপক কথা দিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। যথা, আপনি আর কতদিন এ সংসারে থাকবেন? পরকালের কি সঞ্চয় করেছেন? আপনি কে? —সে জ্ঞান আপনার আছে কি? (ভাষা ঠিক এরূপ না হ'লেও এই ভাবেরই কথা)। কিন্তু এর উত্তরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে dignified উত্তর দেন তা'তে তাঁর চিন্তার সততা ও মর্যাদা বেড়েছে বলে আমরা মনে করি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট উত্তর দেন—তিনি এসব জানেন না; কিন্তু না-জানার জন্যে তাঁর ক্ষোভ নেই। কারণ কেউ সত্যিই জানে কিনা এ সন্দেহ তাঁর আছে। এবং তাঁর attitude-এর সমর্থনে তিনি বেদ থেকে চমৎকার একটী উদ্ধৃতি দিয়েছেন যার তাৎপর্য পরম সত্যকে জানা যায় অথবা হয়ত জানা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি আমাদের প্রচারিত মহাসত্য-দর্শনে—পরম সত্যকে জানা যায় বলাও ভুল, জানা যায় না বলাও ভুল। বেদ-উপনিষদের অনেক জায়গায় এ রকম আপাতবিরোধী কথার দুঃসাহস রয়েছে। এটী কিন্তু অজ্ঞানের স্বীকৃতি নয়, অথবা প্রচলিত পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) নয়। এর কারণ, বেদ-উপনিষদের ঋষিদের জ্ঞান আসলে "নির্জ্ঞানের জ্ঞান" যার মূলে রয়েছে 'নেতি নেতি আত্মা' ও 'অসৎ বা ইদম্-অগ্র আসীৎ' এর মহাতত্ত্ব। আমাদের গ্রন্থাদিতে এসবের যুগোপযোগী আলোচনা রয়েছে।

। রামায়ণে গ্রীক প্রভাব আছে—এ বিষয়ে অবশ্য আর এক জন মহামনীষী ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে সমস্ত বিষয়টী নিয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় একটী বই লিখছেন বলে' জানা গেছে।

ইন্দিরা গান্ধী ও মাদার টেরেজা

সেদিন শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাঁদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হ'লো মাদার টেরেজা তাঁদের মধ্যে একজন। করলেন স্বয়ং আচার্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। খুব আদর করে তিনি মাদারের কপালে কুমকুম তিলক এঁকে দিলেন। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের জাতিরই প্রতিনিধি। মাদার যে এই মহাসম্মানের অধিকারিণী সেকথা সবাই সানন্দে স্বীকার করবেন। কিন্তু এই সঙ্গে নূতন ভারত-গঠনে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের ভাব ও কাজের মধ্যে কোথাও কোনও ফাঁক না থাকে। থাকলে তা' বিচার করতে হবে ও ঠিক পথে পূরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে ফাঁকটা চোখে পড়ছে তা' হচ্ছে মাদার টেরেজার মতো বিশ্বসম্মানের অধিকারিণী মহিলা নিজে ক্রীশ্চান হয়েও ও ইউরোপীয়ান হয়েও ভারতীয় জীবনধারার কয়েকটী মৌলিক রীতিকে বজায় রাখতে চান। তার একটী হ'লো যৌথ পরিবারের নিরাপত্তা ও শান্তি-স্বস্তি। ইউরোপ-আমেরিকায় এর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ নরনারীর দল আজ একান্ত নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় বোধ করেন। সে সমাজের ভিতরের খোঁজখবর কে রাখে? আমরা অন্ধভাবে যৌথ-পরিবারের সমর্থনে কিছু বলছি না। এটা সম্ভব কি না সে কথার মধ্যেও আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু এ নিয়ে যে ভাববার স্কোপ রয়েছে এবং এর মধ্যে ভারতীয় জীবনধারার ত্যাগ-সংযম-সেবা-প্রীতির সত্যতা রয়েছে এ বিচার যেন আমরা না হারাই। এ ছাড়া বিশ্বনারীবর্ষ যখন অনেক ক্ষেত্রে হুজুগে পরিণত তখন মাদারের মুখেই শোনা গেল গৃহজীবনে নারীর সেবা-পবিত্রতা-করুণার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা। সুতরাং ইন্দিরাজীর নূতন ভারত গড়তে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির এই দিকগুলোও বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

ছবির অন্তরালে আরেক ছবিকে দেখি

—শ্রীমু

দর্পিত পাহাড়-চূড়োয়
দুহাতের তপস্যারাত সূর্যকে কাছে টানে একান্ত নিভৃতে,
চঞ্চলা পৃথিবী থির হয়ে
আলোর ডিম্বে তা দেয় মসৃণ মেজাজে,
সবার মুখে এখন সূর্যের সোনালি রঙ,
বিচ্ছুরিত আলোর স্রোতে
স্তব্ধ কোন্ প্রশান্ত বাঁওড় পূর্ণতায় শব্দহীন ;

"কে আপন কে পর,
যায়না চেনা,
"আত্মজ রক্তে শুধু ঢেউ তোলে, অবিরাম।
অসংখ্য মৃত্যু ঘিরে"
"অসংখ্য জীবনের 'অ্যাটোমিক এপিটাফ্'
মর্ম্মরিত 'মিউটেশানে'
অকস্মাৎ বদলে দেয় জীবন আর মরণের ছবি,
জরায়ু-'জিনে' অথবা শব্দ-'এরিণায়'
"রহস্য রসে কোন্ অজ্ঞাত বংশতালিকা"
সাদা-কালো-বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভিন্নতা।

"দুর্জয়কে জয় কোরে
কিংবা তার বাসনায় অন্ত কোথাও, কোনখানে
"সচেতন শ্বাসে নিশ্চেতন হলেই"
আসলকে পাওয়া যায় ;
প্রতি মুহূর্তে আমরা নিশ্চেতন হতেই চাই,
আর চাই বলেই
কবিতা লিখি, গান গাই, ধ্যান করি,
আরো—আরো কিছু করি নিভৃতে নিরালায়।

এখন আকাশ আর সাগরের মাঝখানে
একটা মহাভাবের বেলুন ওড়ে দুর্বোধ্য বাতাসে,
আমি এই মুহূর্তে আর একটা জীবনকে ছুঁই,
ছবির অন্তরালে আরেক ছবিকে দেখি নিজস্ব চোখে
জীবনের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডে—
হাত রেখে কোথায় চলে যাই
সব ছাড়িয়ে, অস্তিত্ব হারিয়ে নিশ্চেতনের পানসি বেয়ে
হে শব্দহীন শব্দ!
আমাকে প্রতিমুহূর্তে নৈঃশব্দে নিশ্চেতন করো।

—::—

নববর্ষের কয়েকটী বিশিষ্ট অভিনন্দন বাণী

"পরমেশ্বর আপনার কল্যাণ করুন। আপনার প্রচেষ্টা শত বাধা বিধা-সত্ত্বেও জয়যুক্ত হোক—এই কামনাই করি।"

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

"আপনার শাশ্বত ভারতের ধ্যানমূর্ত্তির আমিও একজন দীন ক। 'বহুশোভমানা উমা হৈমবতী' আমার ইষ্ট দেবী।"

অনির্বাণ

"স্মরণীয় অনেক প্রবন্ধ এই পত্রিকার গৌরব। 'শাশ্বত ভারত' র উদ্দেশ্য সফল করুক।"

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

"পত্রিকাখানির প্রচার আরও ব্যাপক হলে' দেশ উপকৃত হবে।"

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

"'শাশ্বত ভারতে' প্রকাশিত সমস্ত লেখাই আমি মন দিয়ে । বড় ভাল লাগে"।

কালিদাস ভট্টাচার্য

"জানিনা, বর্ত্তমান ছিন্নমূল সমাজের তরুণ-তরুণীরা আপনার মত ও তপস্বীকে কতটুকু সম্মান দেয়।"

শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল

"জাতির কল্যাণ কামনায় আপনার একক সাধনা লক্ষ্য করে মুগ্ধ ।"

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শাশ্বত ভারত সমিতি" সংস্থাপন

র্ত্তমান বাংলা নববর্ষ থেকে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ত ভারত সমিতি" সংগঠন করা হচ্ছে। কলকাতায় একটী সমিতি ও বিভিন্ন জেলায় শাখা-কেন্দ্র স্থাপন করার প্রচেষ্টা চলছে। দঙ্গে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ্ ও দেশসেবকদের সঙ্গে, লেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক ও প্রধান-শিক্ষক-অধ্যক্ষদের , বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-উপাচার্যদের সঙ্গে, সরকারের শিক্ষামন্ত্রক ও সন-মন্ত্রকের সঙ্গে, বিভিন্ন ক্লাব ও সমাজ-সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গে এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। **উদ্দেশ্য, শাশ্বত ভারতের নূতন জীবনদর্শনের ভিত্তিতে নূতন মানুষের নূতন সমাজ, নূতন সংস্কৃতি, নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্প, নূতন বিজ্ঞান, নূতন শিক্ষা, নূতন পরিবার, নূতন মানবিক সম্পর্ক, নূতন মর্য্যালিটী ও নূতন বিশ্বধর্ম্মের আদর্শ ভাবধারার প্রসার ও সংগঠন।**

আন্দোলনের চিন্তানায়ক শ্রীমৎ সত্যসাধক ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে বর্ত্তমানে এই প্রচার কার্যে ব্রতী হয়েছেন—

অধ্যাপক মুরলীধর সরকার, কবি শ্রীমুন্সী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুস্থির কুমার চন্দ। আরও বিশেষ কর্মীদের নাম পরে জানান হবে।

নূতন ত্যাগব্রতী আদর্শবাদী শিক্ষিত তরুণদের এই নূতন জীবনযজ্ঞে অংশ নিতে বিশেষভাবে আহ্বান জানান হচ্ছে।

বিশিষ্ট সাধুসন্তের সমর্থন-অভিনন্দন

১। "...আপনি ত প্রকৃত ত্যাগী-সন্ন্যাসী। ...প্রাণ দিয়া সেবা করুন।"

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ

(প্রেসিডেন্ট, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) ২৪ | ৪ | ১৯৭৬

২। "...শুধু প্রশংসার যোগ্যই নহে, চিত্তচমৎকার-জনক। ..."শাশ্বত ভারত" ও একখানা হীরার টুকরা।"

—শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস

(অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর) ২।৮।১৩৭৯

৩। "...আপনার জ্ঞানের গভীরতা ও ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি, সর্ব্বোপরি আপনার সাধন-সম্পদ্ আমার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে।"

—ডক্টর শ্রীমৎ স্বামী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

(মহা-উদ্ধারণ মঠ-প্রধান) ১৮।৬।১৯৭৪

৪। "...জাতিকে বর্ত্তমান অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে এ-রকম পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন। যুগোপযোগীরূপে ভারতের শাশ্বতবাণী পরিবেশনের প্রচেষ্টা সার্থক হউক।"

—শ্রীমৎ স্বামী মিত্রানন্দজী মহারাজ

(রামকৃষ্ণ মিশন, কেন্দ্র-প্রধান) ২৯।১১।১৯৭২

৫। "...শাশ্বত ভারত সত্যসত্যই ভারতের শাশ্বতবাণী যুগোপযোগী করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিবেশন করিতেছে। আমার বড় ভাল লাগে।"

—শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দজী মহারাজ
(যুগ্ম-সম্পাদক, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) ২২। ৩। ১৯৭১

আমাদের পুস্তক বা পত্রিকা ও ভাবধারার যাঁরা সমর্থক বা গুণগ্রাহী

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
"বনফুল"
ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য (উপাচার্য)
ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ডক্টর রমা চৌধুরী
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস (উপাচার্য ও কেডারেল প্রধান বিচারপতি)
শ্রীঅম্লান দত্ত (উপাচার্য)
শ্রীদেবেশ দাস (সাহিত্যিক ও ভারত সরকারের সেক্রেটারী)
শ্রীমৃগাঙ্ক মৌলি বসু (চীফ সেক্রেটারী, পঃ বঃ সরকার)
বন্দে আলি মিয়া (কবি)
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (উপাচার্য)
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী)
ডক্টর সরোজিনী মাহিষী (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় উপ-আইন মন্ত্রী)
শ্রীপ্রশান্তিবিহারী মুখোপাধ্যায় (বিচারপতি)
শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ("ভ্রাম্যমান")
শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী
শ্রীঅশোক কুমার সরকার (সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা)
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী
(ওড়িয়া সাহিত্যিক ও শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর পিত
শ্রীক্ষিতীশ রায় (সাহিত্য আকাদেমী-প্রধান)
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য
অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য
শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (আকাশবাণী)
শ্রীঅরবিন্দ রায় (প্রাক্তন কাষ্টোডিয়ান, I. I. S. Co. Burnp
শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ
শ্রীমতী আভা মাইতি
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন
শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় (সাংবাদিক সাহিত্যিক)
প্রফেসার হীরেন মুখার্জ্জি (এম্, পি)
শ্রীবিজয় সিং নাহার
শ্রীসমর গুহ (এম্, পি)
শ্রীসুরেন নিয়োগী (বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন)

—::—

যুগ-গ্রন্থ "অমৃতের পথে" বহু মনীষী ও মহাপুরু
উচ্চ-প্রশংসিত। ৭৪৮ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ জ্ঞানকোষ
মূল্য—১৫ টাকা। বিশেষ ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাস।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—
১। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৪।৩ কলে
ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
৩। "শাশ্বত ভারত" কার্য্যালয়,
পোঃ ও জেলা—বাঁকুড়া

প্রাপ্তিস্থান—"শাশ্বত ভারত" কার্যালয়, বাঁকুড়া। শ্রীমুরলীধর সরকার কর্তৃক বাঁকুড়া এ টু জেড প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক
মহাসত্য আশ্রম বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত।

Regd. No.—W.B./BKU-6

॥ सत्यं परं धीमहि ॥

"এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।"
—এ যুগের ঋষিমন্ত্র

শাশ্বত ভারত

SASWAT BHARAT

(With An English Supplement)

জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ ১৩৮৩ | সম্পাদক—শ্রীমুরলীধর সরকার ঃ Editor—Sri Murali Dhar Sarkar | সপ্তম বর্ষ—৮ম-৯ম সংখ্যা ঃ Seventh Year—8th-9th Issue. | June—July 1976

বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ) | বার্ষিক চাঁদা—চার টাকা ঃ Annual Subscription—Rs. Four | Bankura (W.B.)

A Plea for Neo-Moralism and Neo-Humanism

—An Appeal to Prime Minister Indira Gandhi—

Mrs. Gandhi is to-day the idol of the nation. Providence has placed her in a unique position of political power unsurpassed in the recent history of the nation. Even Gandhiji or Pandit Nehru did not exercise such wide influence over and command such unquestioning obedience from the people as a whole in matters of practical implementation of a national programme. The Emergency and the 20-Point Economic Programme have proved it to the hilt.

It redounds to her credit that Mrs Gandhi has, in the wake of her unique success, not lost sight of the forest for the trees. We mean, with all her engrossing pre-occupations in the political and economic field, she never misses an opportunity of drawing the nation's attention to the urgency of the moral and spiritual rehabilitation of this ancient nation. This is not just a trick on her part to pander to the religious sentiments of the people but it is a firm conviction with her. Neither is it merely a noble inheritance from Mahatma Gandhi or Pandit Nehru, but it has roots in her own personality. She may not be religious in the usual sense but she is, beyond doubt, essnetially spiritual and moral in a broad sense. This was brought out by us in our special issue of July 1975. And it is in a broad sense that India is essentially spiritual and moral.

But it is time that we re-assess the broad sense in which India is essentially spiritual and moral. So far it has been interpreted as mere mystical humanism. It is supposed to be a legacy of the middle ages. The saints like Ramanuj, Kabir, Dadu, Nanak and Chaitanya are supposed to have preached a religion of humanism irrespective of caste, creed or community as against the traditional ritualistic religion of India based on its Varnashram idea. It is true this orthodox tradition of Brahminism had, at the time, outlived its social utility as an invigorating force in the life of the nation. But it is equally true that the medieval religious leaders named above had no direct aim of social reform. They were pre-eminently exponents of new methods of spiritual and moral uplift of the people suited to the age and their criticism of traditional formalism was only a natural by-product. In fact they were equally critical of formalism or begotry in all religions and they combined in their creeds the best elements of Brahminism and Islam not for the propagation of a facile and plastic liberalism on lines of later Renaissance Humanism but simply to carry on the broad moral and spiritual tradition of India which had lost its way in the blackwaters of a defunct Brahminism.

[Contd. on last page]

A Glimpse of South India*

(Specially contributed to Sasvata Bharat by a South Indian Lady)

—Shrimati Kalpagam Duraiswami

Tamil Nadu, originally known as Madras State, occupies a strategic position in the South of India. It is drained by the main river Cauveri. The coast is washed by the Bay of Bengal which merges in the Indian Ocean.

The Tamilian takes immense pride in the rich heritage of Tamil Nadu. His is the oldest living language of India, and an even older culture-tradition which has a continuity from the remote past.

One wishes Tamil were an easier language and not the veritable tongue-twister that it is, to understand and appreciate the richness of its literature. "Scratch a Tamil and poetry flows out of him!" Tamil literature bears ample proof of much anterior poetry, but sadly much of it is now irretrievably lost... The Pandyas and Cholas patronized literature to the core. It is believed that Murugan (Karthik) is the God of Tamil literature among the Tamilians and especially of the Tamilians at Madurai. Among the ancient poets (pulavars) as they are referred to, are Avvaiyar, Tiruvaluvar, Appar, Gyana Sambander, Kamber, Triunavakarasar and Kalidas.

Tamil Nadu is strewn with temples galore of great architectural splendour. The sculpture is celebrated and extensively studied by savants. The temples speak of a high skill in engineering and design, namely, Mahabalipuram which is known for the seven Pagodas (now, unfortunately, six are submerged under water) and Madurai Meenakshi temple known as the thousand-legged temple (because it has 1,000 pillars) Airamkal Mandapam. Besides there are 5 famous Murugan temples. It is no wonder, therefore, that tourists are attracted from far and near to Tamil Nadu.

"To criticize one must qualify" goes the saying. In order to be able to critically appreciate and feel enthusiasm for Carnatic music, one must have some knowledge of it. It is a highly rhythmic and complex art and though not confined exclusively to Tamil Nadu, it is probably in Tamil Nadu that it is best developed. The finest exponent of this type of music is M. S. Subbu Lakshmi, who won the Magsasy award.

Another sphere of art in which the Tamilians have carved out a special niche for themselves, is in Indian dance. It is Bharata Natyam, the classical dance of the region, which only the lithe and lissom can perform. These dances depict stories from ancient Indian culture especially the Ramayana and the Mahabharata.

Religion plays a vital role in the life of Tamilians. They celebrate religious festivals throughout the year like The New Year, Rakhi Purnima, Janmashtami, Vinayak Chaturthi, Navarathri (Dashera), Diwali and Shankaranthi.

The Tamilians are divided into two broad categories namely, Saivaites (worshippers of Lord Shiva) and Vaishnavites (worshippers of Lord Vishnu). The Brahmans are further divided into Iyers and Iyengars. The main characteristic of an Iyer is that he smears 'Vibhuti' (Holy Ash) on his forehead mostly in three horizontal lines. The Iyengars do not use 'Vibhuti' and never enter Lord Shiva's temple. Among the Gurus are Sringeri Swami (followed by Iyengars) and Shankaracharya (followed by Iyers.)

The Tamils observe strict taboo and follow custom rigidly. Some of the day-to-day customs are sprinkling the doorstep with water in the early morning, drawing Alpana (Kolam) and applying turmeric (Haldi) on the body among ladies (though discontinued when she becomes a widow). The older women wear 9-yard sarees known as 'Madisar'. If a couple happen to live long, they re-celebrate their marriage when the man attains the age of sixty and once again when he attains eighty, known as Aravadam Kalyanam and 'Sadabhishekam' respectively.

A Tamilian is renowned for his discipline and intelligence, though when Hindi was to be accepted by them as the national language, they agitated and created chaos. They were apparently prejudiced as regards language. Even now the shops and buses including roads are named and written in Tamil. This may pose a problem to tourists. Schools with Tamil medium of instruction (Contd. last page)

* (The North should sympathetically know the South for true national integration of Bharat.—Editor)

"শাশ্বত ভারত" ও "গুরুবাদ"

"শাশ্বত ভারত" কি "গুরুবাদ" অস্বীকার করে ? —এরূপ শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসা সব সময়েই মহৎ সম্ভবনাপূর্ণ। সেজন্য তার সদুত্তরও সর্বপ্রযত্নে দিতে হবে। বিশেষতঃ "শাশ্বত ভারত" এর মিশন এতই ব্যাপক ও গভীর যে সকলকে নিয়েই এর অগ্রগতি। সেজন্য ন্যায়সঙ্গত সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান আমরা সানন্দে সব সময়েই দিয়ে থাকি। যদিও বিষয়টী নিয়ে আমরা কিছু কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা ও ৯ম সংখ্যা) এবং অদূর ভবিষ্যতে পুস্তক-পত্রিকায় বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে (আমাদের "অমৃতের পথে" নামক গ্রন্থেও এর আলোচনা আছে) তবুও বিষয়টীর গুরুত্ব-বিবেচনায় আমরা এখানে আমাদের বক্তব্যের একটা রূপরেখা দিয়ে রাখছি।

১। "শাশ্বত ভারত" "গুরু" অবশ্যই মানে, কিন্তু "গুরুবাদ" স্বীকার করে না। সম্প্রদায়গত-ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনসাধনায় "গুরু"র সহায়তা বিশেষ কার্যকরী বা এমনকি অপরিহার্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও কোনও কোনও মহাপুরুষ গুরুকরণের উপর জোর না দিয়ে আত্মপ্রত্যয় ও সাধনার উপর জোর দিয়েছেন।

২। "বেদ" গ্রাহ্য হলেও, "বেদবাদ" অগ্রাহ্য (যেমন শ্রীগীতায় প্রকাশ পেয়েছে , । "গুরু" ও "গুরুবাদ" সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

৩। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় সমাজধর্মের যুগে দেশে বহু আচার্য ও গুরু ছিলেন এবং তাঁদের সাক্ষাৎ প্রেরণায় ও সাহচর্যেই ভারতের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জাতীয় জীবন গড়ে উঠেছিল একথা ঠিক। এঁদের নানা পরম্পরা ও সম্প্রদায়ও ছিল একথাও ঠিক। কিন্তু যা সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় তা হলো একটী ব্যাপক ও বাস্তব মানুষ গড়ার ও সমাজ-গড়ার কতকগুলি সাধারণ নীতির উপর ও একটা সামাজিক প্রযুক্তির উপর প্রায় সকলেই জোর দিতেন। আর শুধু জোর দিতেন তা নয়, ঐরূপ সমাজ-ধর্মকেই তাঁরা ধর্মসাধনার মূল কেন্দ্রে স্থাপন করতেন। এবং এজন্য একটী ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনার বহির্ভূত সমাজধর্মের কাছেও সকলেই মাথা নত করতেন। এটী ছিল সর্বসাধারণের বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানসম্মত মহাসত্যের সাধনা। ঈশ্বর-পরমাত্মা গুরু-সদ্‌গুরু-ভগবান-দেবদেবী নিয়ে ভাবপ্রবণ ভক্তগোষ্ঠী রচনা এখানে প্রধান বিষয় ছিল না। একটী বৈজ্ঞানিক বাস্তব জীবনসত্যের জীবনচর্যাই ছিল সর্বোচ্চ ব্যাপার। বৃহদারণ্যকের "নেতি নেতি আত্মা", তৈত্তিরীয়ের "অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ", ঋগ্বেদের "নাসদীয় সূক্ত" ও "পুরুষ সূক্ত"-কে ধরে এবং অন্যান্য শ্রুতি-স্মৃতির সমর্থনে চলত এই জাতীয় জীবনসাধনা। "গুরু" ও "আচার্য"-গণ ছিলেন এই নৈর্ব্যক্তিক অসাম্প্রদায়িক সত্যজীবন-সাধনার প্রেরণাদাতা ও সহায়ক। মহাশূন্যের মহাসত্যই এর আদি-মধ্য-অন্ত-উপায়-লক্ষ্য।

৪। ভারতের ইতিহাসে এই বাস্তব সমাজসাধনা যখন কালের প্রভাবে চূর্ণবিচূর্ণ ও মলিন হয়ে গেল, তখন তার স্থান গ্রহণ করলো নানা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিমুক্তির সাধনা। এই মধ্যযুগেই মধ্যযুগীয় জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি-তন্ত্র-যোগের ব্যক্তিগত সাধনায় প্রাচীন কালের বাস্তববাদী সমাজধর্মী "গুরু" ও "আচার্য"গণের স্থানে দেখা দিলেন ভাববাদী ব্যক্তিধর্মী "সদ্‌গুরু" ও "গুরু"বৃন্দ। তখন স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক সদ্‌গুরু-গুরু-সাধু-সন্ত-মহাপুরুষকে ধরে নানা ভাবপ্রবণ ভক্তগোষ্ঠী রচনা হ'তে লাগল।

৫। ভারতের বাইরে থেকে যে ধর্ম সম্প্রদায়গুলি এসেছে সেগুলিও মূলতঃ এই মধ্যযুগীয় ভাবপ্রবণ ভক্তগোষ্ঠীর সম্প্রদায়। যেমন খ্রীষ্টান ও মুসলমান। এগুলি অবশ্য নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর উদার ও বাস্তববাদী, যদিও প্রাচীন ভারতের অসাম্প্রদায়িক বৈজ্ঞানিক সমাজধর্ম বলতে যা বোঝায় এগুলি তা নয়। সুতরাং ভারতের আর পাঁচটী মধ্যযুগীয় "হিন্দু" ধর্মসম্প্রদায়ের মতো এগুলিও ধর্মসম্প্রদায়।

৬। স্বভাবতই বর্তমান ভারতে (তথা বিশ্বে) আজ মধ্যযুগীয় গুরু-মুরশীদ-সেন্ট-র‍্যাবাই-অর্হৎ-গোঁসাই-প্রভুপাদ-বিশপ-সাঁই-শ্রমণ-সাধু-ফকির এবং সেইসঙ্গে সদ্‌গুরু-অবতার-মেসায়া-সেভিয়ার-তীর্থঙ্কর-তথাগত-রসুল-পয়গম্বরভাবেরই প্রাদুর্ভাব। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-প্যাগোডা ও নানা ভক্তিমূলক বা রহস্যমূলক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারতে ও বিশ্বে আজ প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত মানুষের সমাজ Extinct Species-এর মতো প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে।

৭। সুতরাং আজ যা প্রাকৃতিক নিয়মে অপরিহার্য তা হচ্ছে এই "গুরু"-আশ্রয়ী মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়সাধনাগুলিকে এক বিশ্বমানবিক "মহাসত্য"-আশ্রয়ী সমাজসাধনার মহাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা। তবেই এগুলিও সার্থক হয়ে উঠতে পারে। কালের প্রভাবে নদী-উপনদীগুলি পথ হারিয়ে দিকে দিকে বদ্ধজলার সৃষ্টি করেছে। আজ তাদের মধ্যে মহাসাগরের জোয়ার এনে তাদের সমুদ্রমুখী করতে হবে—সমহাসত্যের এক নূতন প্রয়োজনে ও নূতন নিয়মে। সব গুরুকে বা সব ধর্মকে বা সব সম্প্রদায়কে মৌখিক বা কিছু আন্তরিক ভাবে স্বীকার করলেই বা সম্মান করলেই অথবা সব সম্প্রদায়ের সব ধর্মনেতা বা গুরুকে একজায়গায় ডেকে বসালেই এ বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাবে না। সেরূপ চেষ্টা ইতিপূর্বে এদেশে ও বিদেশে ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ, সীমাবদ্ধ loyalty বড় কঠিন পদার্থ। বহু অবতার-সদ্‌গুরু-গুরুকুলটকিত দেশে ও বিশ্বে একটা formal বা বাহ্যিক মিলন আনার চেষ্টা অর্থহীন। আজ মনুষ্যত্বের ঊষর মরুতে চাই

বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্ব সাধনার "সবুজ বিপ্লব"। এ আসবে এক "মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয়, মহামুক্তির" মহাপ্লাবনের পলিমাটীর উপরে। এজন্য সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিক loyalty-র সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই এক কেন্দ্রাতিগ Superloyalty-র বাস্তব সমাজসাধনা। পরমবাস্তব মহাশূন্যের মহাসত্যের সমাজসাধনাই থাকবে এই Superloyalty-র মূলে। সকল ধর্মেই এই মহাসত্যের বীজ অল্পবিস্তর নিহিত রয়েছে। কতকগুলি সাধারণ ধর্মনীতি নয় বা ঈশ্বর-আল্লা-গড, ইয়াভে-ব্রহ্ম-Oversoul-বোধি-সত্ত্বকে এক বলাও নয়। যুগপ্রয়োজনে আজ তা আসবে এবং মহাপ্রকৃতির নিয়মে ভারতেই হবে সে স্রোতের উৎসের আবিষ্কার। এ মহাতত্ত্ব যদিও বেদের মধ্যে গুপ্ত রয়েছে তবুও এ মহাধর্ম কোনও "বৈদিক" ধর্মও নয় কারণ, ভারতের বেদই বলতে পেরেছে মহাসত্য ধর্ম বেদেরও ঊর্দ্ধে—"তত্র বেদাঃ অবেদাঃ ভবন্তি" এবং ভারতের "ভাগবত"ই ভগবানের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে প্রারম্ভেই ভগবানের জয়গান না করে বলতে পেরেছে মহাসত্যের জয়—"সত্যং পরং ধীমহি"।

আমরা মৃত্যুর পর কিভাবে বেঁচে থাকি

[গত বৎসর শ্রাবণ সংখ্যা বা July Number-এ আমরা এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রারম্ভিক প্রবন্ধ বা ভূমিকা লিখেছিলাম। বিষয়টী এতই জটিল ও দুর্জ্ঞেয় যে এই সংখ্যা থেকে যা' যা' লেখা হবে তা' ঠিকমত অনুধাবন করতে গেলে ঐ ভূমিকাটী আর একবার পড়ে নেওয়া দরকার। যাঁদের কাছে "শাশ্বত ভারত"-এর ঐ সংখ্যাটী আছে তাঁদের আমরা সেটী পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। তবে প্রসঙ্গতঃ আমরা সেখানে যা' বলেছিলাম তার সারমর্ম এইরূপ। —নূতন যুগে নূতন জ্ঞানের প্রয়োজন। সেজন্য আমরা এই বিষয়টী নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ভাবের যত আলোচনা হয়েছে তার বাইরে, তার থেকে নূতন কিছু বলবো। প্রায় সকল মানুষই মৃত্যুর পর কোনও-না-কোনও ভাবে থাকার একটা অস্পষ্ট ভাব, আশা, বিশ্বাস বা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলেন। মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে ভৌতিক, মনস্তাত্ত্বিক, পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক নানারকমের জ্ঞানান্বেষণ চিরকাল চলে আসছে। এর সঙ্গে নানা ভাবের কামনামূলক চিন্তা (wishful thinking) ও কুসংস্কারও আছে। স্নায়ুবিধান (nervous system) নিয়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিজীবন। এই স্নায়ুবিধানে কিন্তু বহু স্নায়ুপ্রান্তে (synapses) পরস্পর "যোগ নেই অথচ যোগ আছে"। এর থেকে "যোগ হারিয়েও যোগ থাকার" একটা সূক্ষ্ম শরীরতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। সমস্ত দেহের কোষসমষ্টির মধ্যেও নানাভাবে বিনাশ ও বিকাশের যুগপৎ অবিরাম গতি চলছে দেখা যায়। এই বাস্তব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি মানুষের দৈহিক ব্যক্তিসত্তার বিনাশের পরও বিকাশের গতির একটা (প্রমাণ না দিলেও) স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। প্ল্যানচেট, সাইকিক রিসার্চ, প্যারা-সাইকলজি, প্রেতাত্মা-নামান, স্লেটলিখন, স্বতঃলিখন, মিডিয়াম, একটোপ্লাজম, প্রেত-ফটোগ্রাফি, দেহধারণ (materialization) ইত্যাদি কোনও সঠিক পূর্ণ সমাধান দেয়না। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদও বিভিন্ন রকমের। মার্কস্-এঙ্গেলসের দর্শনেও এই "না-থাকার মধ্যে থাকা"র মতো একটী তত্ত্ব —যাকে বলা হয় negation of negation—জড়বস্তুর ও জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাসের তলায় রয়ে গেছে। Engels-এর "Living means Dying" কথাটীর মধ্যেও ঐ বিনাশের মধ্যে বিকাশের তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে।

পূর্ব সংখ্যায় আমরা একথাও বলেছিলাম যে অতঃপর আমরা "আসল বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সত্যসাধক ব্রহ্মচারীর নিকট যেমন শুনেছি ও জেনেছি—সেইভাবে তাঁরই ভাষায় লিপিবদ্ধ করে যাবো। এখন আবার সেই কথাই বলছি। —সম্পাদক]

শিষ্য—(প্রণাম পূর্বক) আজ কয়েকটী জিনিষ আপনার কাছে সাক্ষাৎ ভাবে জানতে চাই, যদি অনুমতি দেন।

আচার্য—কি প্রশ্ন? জিজ্ঞাসা করো।

শিষ্য—আচ্ছা, যুগ যুগ ধরে জীবন-মৃত্যুর রহস্যটা মানুষের কাছে একটা দারুণ হেঁয়ালীই থেকে গেছে। এ বিষয়ে যদি একটু আলো দেন। আলোচনা অনেক শুনেছি, পড়েছি। কিন্তু এ যুগের চেতনা তা'তে নিশ্চয়-সমাধান পায় না, হেঁয়ালীর মধ্যেই থেকে যায়। আপনি যুগসিদ্ধ, —মহাসত্য পরমদেবতার অনুপ্রেরিত। তাই, সাক্ষাৎভাবে আপনার কাছেই সত্য সমাধান জানতে চাই।

আচার্য—রহস্যটা বিরাট ও ব্যাপক। সুতরাং ঠিক কোন্ কথাটা জানতে চাও এটা স্পষ্ট হলে বোঝাবার সুবিধে হয়।

শিষ্য—মৃত্যুর পর মানুষ বেঁচে থাকে কি? থাকলে কিভাবে থাকে?

আচার্য—দেখ বাবা, এখানে শ্রদ্ধালু স্থিরচিত্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে সব সত্য নিরূপিত হয়। সেজন্য ঠিক উত্তর পেতে গেলে ও ঠিকমত তা' নিতে গেলে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাও 'ঠিক' বা স্বচ্ছ হওয়া দরকার। নচেৎ, এই অজ্ঞানের জীবনে কত রহস্যই ত রয়েছে, কত রহস্য নিয়ে কত ভাবেই ত নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। সুতরাং প্রশ্নের মধ্যেও যেন গোলমাল না থাকে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসা থাকে। দ্বিতীয়টি তোমার রয়েছে। কিন্তু প্রথমটীর দিকেও লক্ষ্য রাখ। তুমি জিজ্ঞাসা করছ, মৃত্যুর পর মানুষ বেঁচে থাকে কিনা। কিন্তু মৃত্যু ও বেঁচে থাকা এ দুটো কথা পরস্পর-বিরুদ্ধ। সুতরাং মৃত্যু হলে আর বেঁচে থাকার প্রশ্ন আসে কি করে?

শিষ্য—হ্যাঁ আচার্যজী, কথাটা ঠিক। তাহ'লে প্রশ্নটা কিভাবে করি! প্রশ্ন ত একটা রয়েছে। (স্থিরভাবে চিন্তা)

আচার্য—বরং এই বলো—এবং তাই বোধ হয় বলতে চাও—যে মৃত্যুর পর মানুষের কোনও রকম অস্তিত্ব থাকে কি না। আর থাকলে সেটা কি রকমের। তাই না?

শিষ্য—(বিনতভাবে) হ্যাঁ, আচার্যজী, প্রশ্নটা আমার তাই।

আচার্য—দেখ, মৃত্যুর পরে একটা অস্তিত্ব অবশ্যই থাকে। কিন্তু সেটা নূতন বা রহস্যময় কিছু নয়। মৃত্যুর আগে যে রকমের অস্তিত্ব ছিল, ঠিক সেই রকমটাই থাকে।

শিষ্য—তাহ'লে বুঝলাম মানুষ মৃত্যুর পরও থাকে। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটার কৃপা করে সমাধান যদি দেন।

আচার্য—হ্যাঁ, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটায় এবার আসছি—মৃত্যুর পর মানুষ কিভাবে থাকে। এখানেও সেই একই উত্তর,—যেভাবে জীবনে রয়েছে সেই ভাবেই থাকে।

শিষ্য—তাহ'লে ত মনে হচ্ছে, মানুষ মৃত্যুর পর বেঁচেই থাকে! কারণ এ জীবনে মানুষ বেঁচে রয়েছে বলেই আমরা জানি।

আচার্য—না বাবা, মানুষ 'বেঁচে' নেই। থাকলে মৃত্যুর পরেও 'বেঁচে' থাকতো। জানতো শ্রীগীতার কথা?—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ", অর্থাৎ যা' সত্যিসত্যিই আছে তার কখনো না-থাকা হয় না। মানুষ সত্যিসত্যিই বেঁচে থাকলে মৃত্যুর প্রশ্নটাই আসত না।

শিষ্য—এতো আরও রহস্যের মধ্যে পড়া গেল, দেখছি! এখন আপনিই কৃপা করে উপদেশ দিন। আমার মাথায় আর কুলোচ্ছে না।

আচার্য—না, তা' কেন? তোমার মাথায় ঠিকই কুলোচ্ছে, আরও কুলোবে। মনে রেখো, আচার্য ও শিষ্য মিলে একটা Compound Activity চলে। যাই হোক, তোমাকেই এখন প্রশ্ন করছি,—বেঁচে থাকাটা কি বস্তু?

শিষ্য—Biology তো বলে নিঃশ্বাস নেওয়া, খাদ্য খাওয়া, শরীরের বৃদ্ধি, চলে বেড়ানো, বংশবৃদ্ধি করা, ও মৃত্যু এই সব হচ্ছে 'Life' বা বেঁচে থাকার লক্ষণ। এর সঙ্গে রক্ত-চলাচল ইত্যাদি ব্যাপারও হয়ত আছে।

আচার্য—এগুলো দৈহিক জীবনের এক প্রকারের লক্ষণ অবশ্যই বটে। কিন্তু দৈহিক জীবনটা যে কি বস্তু তার নিরূপণ এর মধ্যে নেই। এ ছাড়া—ঐ ক্রিয়াগুলিও জীববিজ্ঞানের দিক দিয়েই একতরপা নয়। শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে শ্বাস ছেড়ে দেওয়াও সব সময় চলছে, খাদ্য খাওয়ার সঙ্গে খাদ্য বের করে দেওয়াও চলে। শরীরের বৃদ্ধি খানিক দূর হয়ে তারপর থেমে যায়, চলে বেড়ানোও ক্লান্তি-অবসাদে বা প্রয়োজনের তাগিদে থেমে যাওয়ার রূপ নেয়, বংশ-বৃদ্ধির মূলেও Cell-division বা একটা জীবকোষ নিজেকে ভেঙ্গে অর্থাৎ ধ্বংস করে দু'টো জীবকোষ হয়। যৌন প্রজননের ক্ষেত্রেও সাময়িকভাবে হ'লেও নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার অর্থাৎ একভাবে মেরে ফেলার মতো একটা ভাব থাকে। এ ছাড়া যে নিষ্ক্রিয়াও সব সময়ে সব বয়সে বা সব পরিবেশে হয় না। প্রায়ই নানাভাবে Inhibited হয়ে থাকে। আর বংশবৃদ্ধি করার পিছনে বংশনাশ করার ভাবও যে কতভাবে ক্রিয়া করে তা'ও ভেবে দেখার মতো। এমন অনেক প্রাণী আছে যারা নিজেদের বাচ্চাদেরই খেয়ে ফেলে। কোনও কোনও প্রাণী নাকি যৌন-সঙ্গমের পর মরেও যায়। আবার প্রকৃতির নিয়মে যে বংশ বাড়লো সেই বংশেরই মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষে কত বংশনাশ ঘটছে সেটাও হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। একটা জীবের জন্ম দিতে কত লক্ষ কোটী জীবন-শুক্রাণু বিনষ্ট হয় তা'ও শরীরতত্ত্বের অজানা নেই। সুতরাং প্রকৃতি যে বংশবৃদ্ধি করতেই চায় তাই বা বলা যায় কি করে? আসলে দৈহিক জীবনের দিক দিয়েও "বেঁচে থাকা" একটা খুব অস্পষ্ট কথা।

[ক্রমশঃ]

মন্ট্রিলে অলিম্পিক ঃ আমাদের ভাবনা

ক্যানাডার মন্ট্রিল শহরে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মহাসমারোহ শুরু হয়েছে। বার'শ কোটী টাকার ব্যাপার, ইলাহী কাণ্ড! রেণেসাঁস যুগের উপযোগী ব্যাপারই বটে। "আধ্যাত্মিক" আনন্দের পরিবর্তে বাস্তব জীবনের আনন্দ নিয়ে চলাই রেণেসাঁসের মূল সুর। ঐ সুরেই এ যুগের সভ্যতা নিত্য অনুরণিত। ইহ জীবনে আনন্দ চাওয়া-পাওয়া অন্যায় বা অস্বাভাবিক বা নূতন কিছু নয়। কিন্তু রেণেসাঁসের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার ভাব ছিল। তা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার (ইহ-বিমুখতার) বিরুদ্ধে। এর প্রয়োজনও ছিল। অর্থাৎ "ধর্ম্ম" বা 'আধ্যাত্মিকতা" যখন ইহকালকে চাপা দিয়ে পরকালের কারবার ফলাতে চায়, তখন মানুষ হয় "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ"। ইউরোপে মধ্যযুগের অন্ধকার যুগে তাই ঘটেছিল। চাপা দিয়ে কখনো স্বাভাবিক উর্দ্ধগতি হয় না। এর জন্যে চাই ইহজীবন ও পরজীবনের সমন্বয়। সে সমন্বয় মধ্যযুগের মতো বর্ত্তমান

যুগও এখনও দিতে পারে নি। কাজেই সমস্ত সভ্যতা যদি একপেশে হয়ে একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু ভাববার অনেক কিছুই আছে।

মানুষের ইহজীবনের উপরে একটা আত্মিক জীবন রয়ে গেছে, প্রকৃতির বিধানে—ইহজীবন যার লেজুড় মাত্র। সুতরাং দেহের ব্যাধি নিয়ে শুধু ল্যাজ নাড়লে কি হবে? মানুষ ও মানুষের সমাজের আজ সেই অবস্থা। যৌনকাম, ধনকাম, লোককামের লেজুড় খুব আন্দোলিত হচ্ছে কিন্তু দেহে ও প্রাণে আনন্দ নেই। তাই মনুষ্যত্বও নেই, প্রেমও নেই। উদাহরণ চান? এই অলিম্পিক খেলার মহাসম্মেলন থেকেই দিতে পারি। ১৯৭২ সালে কি হলো? মনে নেই কতগুলি নিরীহ খেলোয়াড়কে ঐ মহাসম্মেলনেই রাজনৈতিক কারণে অতর্কিতে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হলো? সুতরাং আসল খেলাটা ঢুকে আছে রাজনীতির মধ্যে। আজও বলা হচ্ছে এই বিশ্ব-অলিম্পিকের উদ্দেশ্য বিশ্বের সমস্ত দেশ ও জাতির মধ্যে মিলন। সবজাতি এখানে মিলিত হয়ে "প্রেমানন্দে গৌরহরি হরিবোল" বলবে। এজন্য মহাসমারোহে অলিম্পিক মশাল গ্রীস থেকে ক্যানাডায় নেওয়া হলো এবং রাষ্ট্রকর্ণধার তা তুলে ধরলেন—সকল জাতির মহা-মিলনের প্রতীক রূপে। কিন্তু এবারও ভাইওয়ানের সমস্যা নিয়ে বহু কষ্টে টাল সামলাতে হচ্ছে। বর্ণবৈষম্যের সমস্যা নিয়েও এখানে রাজনীতির জের টানা হচ্ছে। ভাবটা যেন এইরকম যে রাজনীতিই বোধহয় প্রধান মানবিক নীতি। এর ব্যর্থতা দেখেও মানুষের চোখ ফুটছেনা। ভারতের নেত্রী শ্রীমতী গান্ধী বারে বারে বলে আসছেন—নিছক বিলাতী রাজনীতি-অর্থনীতিতে স্থায়ী সুফল আসবেনা। এর সঙ্গে চাই নূতন সমাজনীতি ও অধ্যাত্মনীতি।

কিন্তু অসুবিধে দাঁড়িয়েছে এই যে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জাগতিকতার যে নূতন সমন্বয় প্রয়োজন তা আজও দেখা যায় নি। তার কারণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ নূতন এক ব্যাখ্যা—এক নূতন দর্শন—যা আজ জগতের একান্ত কাম্য তার প্রচার হয়নি। পুরাতনের জের টেনে তা সম্ভব নয়। তা যদি হতো তবে আজ থেকে শতাধিক বৎসর আগেই ত ইংলণ্ডের মনীষী লেখক ঘোষণা করেছিলেন—"Sports are a Machinery." অর্থাৎ, নিছক খেলাধূলা কখনো লক্ষ্য নয়, এগুলি লক্ষ্যে পৌঁছাবার নানা যন্ত্র-পাতির মধ্যে এক যন্ত্রপাতি মাত্র। চাই "Sweetness and Light" অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মাধুর্য ও জ্ঞানের আলো। মানুষ সে মাধুর্য ও জ্ঞান আজ বিসর্জ্জন দিয়েছে।

সুতরাং ইহজীবন ও পরজীবনকে সমন্বিত করার এক নূতন দর্শনই এখন আমাদের ভাবনার বিষয়।

A Physician Prays

"কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্।"

—Kali Kinkar Sengupta

Lord!

Inscrutable in Thine own design
Thou givest pleasure and pain,—
In pleasure, may we think of Thee,—
In pain, to never err again.

Whate'er we do or want to do
To seek and find our selfish end,—
Teach us not to swell ourselves
But our selfish manners to mend.

If I save one heart from breaking
Or help one's failing hopes revive,—
Let my own heart revel in cheers
To see that others live and thrive.

If I cure one fest'ring sore
Or soothe one sharp and shooting pain,—
May I never crave for heaven
But pray to be born to serve again.

Those that die and die by inches,
Those whose lives are worse than death,—
Grant me faith that I may give them
Nerve of steel and brawn of strength.

Teach my tongue to preach Thy Grace
When I fail to find a cure,—
In Thy Mercy to pin their faith
Resign in silence and endure.

সমাজধর্ম ঃ রাষ্ট্রনীতি

১। মুখ্যমন্ত্রী **শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়** বলেছেন—দফা কর্মসূচীকে গীতা, বাইবেল, কোরাণের মতো অপরিহার্য বলে মনে করতে হবে। খুবই ভাল কথা, সৎ কথা এবং কাজের কথা সন্দেহ নেই। মাননীয় সিদ্ধার্থবাবুর মতো বিরাট কর্মী পুরুষের যোগ্য কথাও বটে। সিদ্ধার্থবাবু বা তাঁর অনুগামীরাও এত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথাকে শুধু বলে' যেন ক্ষান্ত না দেন। আমরা গুরুত্ব দিয়েই কথাটা বলছি। অর্থাৎ, আমাদের বক্তব্য সিদ্ধার্থবাবুর এই কথা জাতীয় জীবনে কার্যকরী করতে গেলে দু'টী জিনিষের প্রয়োজন। প্রথম—গীতা, বাইবেল, কোরাণকে লোকে বাস্তব জীবনে, সমাজ জীবনে গুরুত্ব দেয় কিনা দেখতে হবে। দেশের নেতা, প্রশাসক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিতগণকে বাস্তব জীবনে এই গুরুত্ব দিতে শিখতে হবে। দ্বিতীয়—গীতা, বাইবেল, কোরাণকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করে এক নূতন অসাম্প্রদায়িক, বৈজ্ঞানিক সমাজধর্মের স্তরে সমন্বিত করতে হবে। একমাত্র তা হ'লেই কুড়ি দফা কর্মসূচীর মতো পবিত্র সমাজধর্ম্ম-পালনকে গীতা, বাইবেল, কোরাণের সঙ্গে সমপর্যায়ের বস্তু বলে ভাবা যেতে পারবে। সিদ্ধার্থবাবু ও দেশনেতারা এরূপ এক নূতন সমাজধর্মের সন্ধান করুন এবং প্রবর্ত্তনে আগ্রহী হোন, এই আমরা বলি।

* * * * *

২। প্রধান মন্ত্রী **শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী** মধ্যে মধ্যে ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতি বা আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে বেশ মূল্যবান্ ও খুবই সুন্দর কথা বলেন। আমরা এতে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হই। এই যেমন সেদিন তিনি বল্লেন—যোগসাধনা মানুষের মনে প্রশান্তি এনে দেয় যাতে বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার মধ্যেও ঠিকমত চলা যায়। আর একদিন তিনি আর এক জায়গায় বল্লেন—ধর্ম্মনিরপেক্ষতার জন্যেই আমরা অধর্মকে না ধরে প্রকৃত ধর্মকে সকল ধর্মের মধ্যেই দেখতে পারছি। মধ্যে মধ্যে ভারতীয় ধর্মনেতারা এসে প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির গ্লানি দূর করেছেন। এখন তেমনি এক সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। সাধক এবং পণ্ডিতেরা যদি ধর্মকে এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে এসব গ্লানি দূর করতে না পারেন তবে ভারতের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

খুবই forceful ও আন্তরিক কথা সন্দেহ নেই। ভারতে এক যুগোপযোগী নূতন ধর্মের ব্যাখ্যা দিতে গেলে এবং তা প্রচার করতে গেলে একদিকে চাই নূতন যুগসাধকের সাধনা ও অন্তর্দৃষ্টি এবং অপর দিকে চাই রাষ্ট্রশক্তিকে সেই নূতন ধর্মদর্শনে উদ্বুদ্ধ হওয়া ও তার প্রচার প্রসারে ব্রতী হওয়া। এটী যেহেতু কোনও সম্প্রদায়ের বা বিশেষ গুরুমহাপুরুষের ধর্ম নয় সে হেতু রাষ্ট্রের পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া খুবই সমর্থনযোগ্য হবে। আমরা বারবার বলেছি পুরাতন ধর্মের ধারা অনুবর্তনে এ মানবিক সমাজ-ধর্মের সাধনা সম্ভব নয়। এযুগে সমাজশক্তি বলে কিছু নেই, রাষ্ট্রশক্তি-কেই সে দায়িত্ব নিতে হবে। নচেৎ নানা রাজনৈতিক ওলটপালটের ভিতর দিয়ে বহু বিপর্যয়ের পর ইন্দিরাজীর আকাঙ্খিত নূতন মানবিক ভারতধর্ম দেখা দিতে পারে। সুতরাং আমাদের আবেদন ইন্দিরাজী আজ এই নূতন জীবনদর্শনের সন্ধান করুন। শুধু 'যোগসাধনা' ভারতের সমাজধর্মের সাধনা নয় একথাটাও মনে রাখতে হবে। ভারতীয় 'হিন্দু' ধর্মে—শ্রীমতী গান্ধীর মতে—অনেক মহান্ গুণ থাকলেও সাধারণ জনগণের সম্বন্ধে অবহেলা ও অবজ্ঞার ভাব নিন্দনীয়। এর সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার আজও কেন হচ্ছে না—এবং এটী হবার ঠিক পথ কোনটী তার বিচার নিরপেক্ষ বিপ্লবী অথচ ভারতধর্মে শ্রদ্ধাবান্ যুগসাধকের দ্বারাই হতে পারে। Sentimental সংস্কার বা romantic ভাবপ্রবণতা এর সমাধান দিতে অপারগ।

॥ স্ফুলিঙ্গ ॥

—শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে
একটা স্ফুলিঙ্গ আছে
অন্তর্নিহিত দেবত্ববিকাশের
অসীম সম্ভাবনার স্ফুলিঙ্গ।
"অমৃতস্য পুত্রা:"—
মানব জাতির উপনিষদোক্ত
উজ্জ্বল পরিভাষা,
সে যখন শোনে—
দৃঢ়ভিত হয়ে ওঠে এক আশা
হৃদয়ের কোণে।
স্ফুলিঙ্গই একদিন নেবে
লেলিহান রূপ
আর, তারই শিখায়—
অনন্তযাত্রী মানুষের পথ রোধ করে
যে সব কুটিল বাধা—
জ্বলে পুড়ে হয়ে যাবে সব
ভস্মের স্তূপ।

———

A Glimpse of South India

(Contd. from Second page)

are said to be on the increase.* The Tamilians have succeeded in making their presence felt in nearly every sphere of activity. They are often blamed for being a little too condescending and patronizing to achieve their ends. This is not however the whole truth. They, like the Bengalees and the Malayalese, offer stiff competition and more often than not, come out on the top. Names, like statistics, donot help to paint the full picture but then they are a vital part. To mention the names of a few Tamilians who have done credit to India and Tamil Nadu, one must begin with late C. Rajagopalachari (popularly known as Rajaji). In the field of spor s we have Ramanathan Krishnan and in music, M. S. Subbalakshmi. The list would remain incomplete without the name of that mathematical wizard Ramanujan and Nobel Laureate Scientist, Sir C. V. Raman. One should not begrudge a Tamil his pride and his boasts, for it is quite obvious that nature and history have sided with him.

The people of the four Southern states—Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka (erstwhile Mysore) have so much in common that the average North Indian fails to acknowledge their separate identities and calls them "Madrasis" irrespective of the state of their origin.

All these states possess very ancient cultures and have some of the oldest living languages. The people here can be justly proud of their literature and poetry which are highly developed.

It is in the South that one may see all the features of Hinduism being still followed ever so strictly. Casteism is still at its height and plays an important part in the every-day life of the common man. Steps are however being taken by the Government to eradicate the evils of casteism, but the South Indian's ways die hard. He is the perfect staunch Hindu and it will be indeed a creditable feat if he is made to shed his conservatism which is his second nature.

The South Indian dishes have become famous all over India and have caught the imagination of foreigners also. The South Indians themselves occupy special places in nearly all spheres of life. (End).

* The article was written before the present regime.—Ed.

A Plea for Neo-Moralism and Neo-Humanism

(Contd. from first page)

And this timeless tradition could be kept going by "modernizing" old religious ideas. The old ideas were the age-old practice of the right human principles of self-sacrifice, self-restraint, social justice and sex-discipline and the new cast was the worship of the One God, a general attitude of devotionalism and love of both God and man together with its corollary of human equality as against a socio-spiritual system. It is to be remembered that the idea of social justice was already rooted in the Indian tradition but it had no occasion to be separated from the body-politic whose special function it was in the social spiritual set-up. This is clearly mentioned in the Brihadaranyaka Upanishad. Nor could the practice of this social justice be separated from the four corner stones of Indian spirituality and morality as noted above. And it is worth while to remember that in the Indian tradition before the decadent middle ages, the practice of these cardinal virtues were integrated with a graded socio-cultural development which might also be called the educational policy of the state and society.

On final analysis it was a type of practical socialism based on essential (and not creedal as in other religions) spirituality. But as the edifice had crumbled in the middle ages there was an easy inroad of non-indigenous liberalism of the Christian and Islamic type supported by the zeit-geist or the time-spirit out of which it also might be said to have developed naturally. It may also be noted in passing that the idea of One God and His worship was also a latent element in the Indian tradition of the early period though it was not the dominant element. The dominant element was the socialistic realization of the Supreme Spirit, or Truth in which the idea and worship of gods or One God were not the essential features.

Henee it was that humanistic socialism in Ancient India had no need of creedal, 'religious' or sentimental-emotional "social service" as it was the warp and woof of a socialistic state with a spiritual goal of the realization and expression of the One in the Many on a graded scale of human development.

[To be continued]

প্রাপ্তিস্থান—"শাশ্বত ভারত" কার্যালয়, বাঁকুড়া। শ্রীমুরলীধর সরকার কর্তৃক বাঁকুড়া এ টু জেড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক মহাসত্য আশ্রম বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত। Printed by Sri M. D. Sarkar (Editor—Publisher) at the A to Z Printing Works, Bankura (W. B.)

Regd. No.—W.B./BK.Dis-3

॥ সত্যং পরং ধীমহি ॥

এ যুগ মহাজাগরণের যুগ,
এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ,

শাশ্বত ভারত

এ যুগ মহামিলনের যুগ
এ যুগ মহামুক্তির যুগ।'
—এ যুগের ঋষি

(জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্যক্ দর্শী বিজ্ঞাপনবর্জিত পত্রিকা)

ভাদ্র—কার্ত্তিক ১৩৮৩ | সম্পাদক—অধ্যক্ষ-অধ্যাপক ঃ শ্রীমুরলীধর সরকার | সপ্তম বর্ষ ১০ম-১২শ সংখ্যা ঃ বার্ষিক দক্ষিণা—চার টাকা | August—October. 1976

—এই সংখ্যায় আছে—

১। সত্য সাঁই-বাবা ইত্যাদি সাধুদের "অলৌকিক' ক্রিয়া-কলাপ নিয়ে যে হৈ-চৈ চলছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা "অলৌকিক ও ভারত ধর্ম।" ২। দু'টী অনবদ্য আত্মিক আবেগ-সংকটের কবিতা ঃ লেখক-"বনফুল" ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। ৩। রামায়ণ-প্রসঙ্গ নিয়ে জাতীয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি। ৪। বালীদ্বীপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৫। সপ্তর্ষির জিজ্ঞাসা ঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬। মা দুর্গার গায়ের রং কি? ঃ শ্রীসুখময় সরকার ৭। "শাশ্বত ভারত"কে আরও অভিনন্দন।

অলৌকিক ও ভারতধর্ম

সকল যুগে সকল ধর্মে অলৌকিকের কমবেশী স্থান রয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। ধর্ম জিনিষটাই এক অর্থে অলৌকিক, অর্থাৎ ঠিক ঐহিক ব্যাপার নয়। এর কারবার এই জীবনের উর্দ্ধের ব্যাপার নিয়ে। এ ছাড়া জীবন জিনিসটাও অলৌকিক নয় কি? —অর্থাৎ খুবই রহস্যময় একটা ব্যাপার? সুতরাং জীবনেও আমরা অলৌকিককে মানি ও খুঁজি। এজন্য দেখা যায় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-রাজনীতিক-সাহিত্যিক-উচ্চশিক্ষিত-জ্ঞানী-গুণীরাও অনেকে আড়ালে তাক-তুক-ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-কবচ-মাদুলীতে বিশ্বাসী। আর কোনও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুর সন্ধান পেলে ত কথাই নেই। এঁদের কাছে ধর্ণা দিয়ে বহু কিছু ইচ্ছাপূরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) এস্থলে ক্রিয়া করে। ধনলাভ-অর্থলাভ-যশোলাভ-স্বাস্থ্যলাভ, ছেলের চাকরী-মেয়ের বিয়ে-মোকদ্দমায় জয়লাভ-লটারীতে টাকালাভ, এমনকি প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রেমলাভ ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে অলৌকিকের প্রভাব অপরিসীম। শোনা যায়, নেতাজী সুভাষও অভিচার ক্রিয়ায় বিশ্বাস করতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দও একবার এক সাধুর অভিচার ক্রিয়ায় বিব্রত হয়ে মা সারদাদেবীর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য এইসব মহামানবেরা কখনো অলৌকিকের উপর কোনও প্রত্যাশা বা নির্ভরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। সাধক ও সিদ্ধদের মধ্যেও অনেকেই অলৌকিক শক্তি বা বিভূতিকে সত্যসাধনার বিশেষ অন্তরায় বলেই মনে করেন।

কিন্তু তবুও ব্যাপারটা রয়েই গেছে। এজন্যে এখনও—এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও—সাধুসন্ত-সাঁইফকিরদের কেন্দ্র করে একটা অলৌকিক দেখবার বা দেখাবার ইচ্ছা ও আগ্রহই প্রবল। কোথাও এটা প্রকট কোথাও চাপা। এর কারণও সুস্পষ্ট। মানুষের মধ্যে romantic escapism বা রমণীয় বিস্ময়কে ধরে বাস্তব থেকে পালাবার ইচ্ছা চিরদিনই তীব্র। আসলে ধর্মের রাজ্যে এই অলৌকিকবাদ মানুষের একটা চিরন্তনী দুর্বলতাকে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে।

তবে কি অলৌকিক বলে সত্যই কিছু নেই? বাইবেলের মিরাকল-গুলো তাহলে কি? যোগীদের নানা অলৌকিক কাণ্ড তাহলে কি মিথ্যে? হয়ত অনেকক্ষেত্রে অনেকটা বা কতকটা তাই অথবা খানিকটা সত্যের ফেনানো-ফেটানো অত্যুক্তি। কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা বা ভাবনাটা সেখানে নয়। আমাদের চিন্তার বিষয়, ভারতধর্মে এর প্রকৃত স্থান কোথায়। কারণ, বাস্তব সত্যজীবনের ধর্মকে ধরে এগিয়ে যাবার ও জগতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দিন আজ এসে গেছে। শাশ্বত ভারত আজ সব সময় সব ক্ষেত্রে সত্যিকার সত্যবিচারকে ধরে বাস্তবে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাবে। সত্যিকার সত্যেই সত্যিকার সুখ, সকলেরই পক্ষে। সুখের কোনও আভিজাত্য নেই— দু'চারজনের জন্য দু'চার মিনিটের এমনকি দু'চার ঘন্টার সমাধিসুখও ভারতধর্মের লক্ষ্য নয়। ভাবের ঘোরে ঘোঁট পাকানো বা জটলা করার আদিম সাম্প্রদায়িক বৃত্তির চরিতার্থতা

ারতধর্মের প্রধান কথা নয়, উপকথা মাত্র। একটা বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক মাজনীতি স্রোতের ইঞ্জিনীয়ারিং এর বাস্তব ও মূলকথা। কিছু লৌকিক শক্তিধারীদের চারদিকে জীববিশেষের পালের মতো ভিড় করা স্তব গাওয়া ভারতধর্মের স্বরূপ নয়। অমুকবাবা কোন্ রোগ সারিয়েছেন, বা ম্যাজিকের মতো কি অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়েছেন বা এমনকি কি রকম নের কথা বলে দিয়েছেন অথবা সাময়িকভাবে মনের অশান্তির মাত্রাটা একটু কমিয়েছেন—এসবের কোনওটাই ভারতধর্ম নয়। বেদ-উপনিষদ-ামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ যুগের যে জীবন্ত ভারতের আদর্শ আজও আমাদের বিস্ময়ের ও আগ্রহের বস্তু হয়ে রয়েছে তা' হচ্ছে জাগতিক জীবনের মধ্যেই আত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ সেই পথে যাচ্ছে কিনা সেইটেই তার সূচক ও মানদণ্ড। এইখানে ঠিক পড়লে জানতে হবে ভারতধর্ম সেখানে নেই,—আছে এক উপধর্ম নিরীড়জোর আপদ্ধর্ম। শুধু ভাল কীর্ত্তনের ও প্রসাদ বিতরণের জাঁক-মক, ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, জ্ঞানবিচারের কচকচি, সোস্যাল সার্ভিসের অবসরবিনোদন বা সমাজসেবায় আত্মতৃপ্তি, যোগসাধনার বা সমাধি-লাভের টেকনিক্যাল কালচার, এসবের মধ্যে সত্যিকার ভারতধর্ম নেই। এমনকি কোনও সাধুমহাত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি থাকলেও, সাধু চরিত্র থাকলেও—মানুষকে উন্নত করার ইচ্ছা থাকলেও, স্কুলকলেজ-হাসপাতাল খোলার কৃতিত্ব থাকলেও যদি অলৌকিক দেখিয়ে লোককে প্রভাবিত করার দিকে ঝোঁক থাকে তবে বুঝতে হবে ভারতধর্মের মহাত্মা তিনি নন। মহাত্মাদেরও কম্প্লেক্স থাকে—'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি'—এ গীতার কথা। সুতরাং কিছু অলৌকিক বিভূতি দেখাবার শক্তি থাকলেও এবং সাধুচরিত্র হলেও ভারতের বাস্তব সমাজধর্মী ঋষিপদ-বাচ্য তিনি নন। দুঃখের বিষয় গত সহস্রবৎসরের মধ্যযুগীয় ধর্মে এই রকম সাধুসন্ন্যাসীরাই সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছেন। যাঁরা এরকম সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্ষমতার বাস্তব প্রমাণ পাবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে যান তাঁরাও আর এক হিসেবে কম্প্লেক্সগ্রস্ত। এরা হচ্ছেন উল্টোদিকের অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানরাজ্যের 'সাধুমহাত্মা।' এঁরা সব শরীর-বিজ্ঞান বা রাসায়নবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে অধ্যাত্ম রাজ্যের ব্যাপারগুলোকে যাচাই করতে চান। এরকম চেষ্টা আজ নূতন নয়, আগেও হয়েছে। যেমন, কোনও মহিলা অন্নজল গ্রহণ না করেও বেঁচে আছেন ও কাজ করেন জেনে বিদেশ থেকে কিছু কিছু কৌতূহলী বিজ্ঞান-গবেষক ইতিপূর্বে ভারতে এসেছিলেন। এবং আমরা যতদূর জানি ব্যাপারটা মিথ্যে বলেও প্রমাণিত হয়নি। ভারতের বাইরেও এরূপ আধ্যাত্মিক 'ফ্রীক অফ নেচার' বা প্রকৃতির খেয়াল দেখা গেছে এবং তাতে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও জেগেছে কিন্তু কাজের কাজ হয়নি, না বিজ্ঞানের, না ধর্মের। তেমনি সমাধি অবস্থায় brain current বা মস্তিষ্কে তাড়িত-স্রোত মাপার জন্যে যন্ত্রপাতি নিয়ে কিছু বিদেশী এদেশে এসেছিলেন একবার। সুখের বিষয় কিছু কিছু সাধুসন্ত এঁদের কাছে 'পরীক্ষা' দিয়েছিলেন—কিন্তু ফল কিছুই হয়নি,—না এদিক না ওদিক। কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টাকে আমরা আর একদিকের কম্প্লেক্স বল্লেও ঠিক যে হতাশ করি তা নয়। কারণ, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এই লাইনে গবেষণা করতে করতে এখন না হলেও পরে মানুষের অলৌকিক শক্তির 'বৈজ্ঞানিক' জ্ঞান লাভ করে তাকে ব্যপকভাবে মানুষের কল্যাণের কাজে হয়ত কিছুটা লাগাতে পারে। বিশেষে ভারতধর্মে বৈজ্ঞানিক ও সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এতই সুস্পষ্ট যে সাধুসন্ত ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এরূপ সহযোগিতায় এযুগে অস্বাভাবিকতা বা অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু একটা সর্ত্ত অবশ্যই থাকবে। তা হচ্ছে সাধুদের হতে হবে বাস্তববাদী ও বৈজ্ঞানিক গবেষকদের হতে হবে অধ্যাত্মবাদী। অবশ্য এরূপ যুগোপযোগী চেহারাবদল আজও ঘটেনি।

তবুও আসল কথাটা ভুললে চলবে না। তা হচ্ছে এই যে ভারতধর্ম এই সব অলৌকিকের ওপর মোটেই জোর দেয় না। শুধু ক্ষতিকর নয়, একে অকিঞ্চিৎকরও ভাবা হয়। যেমন আগের যুগে যৌগিক শক্তিতে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ সম্ভব হতো কিন্তু এযুগে ব্যাপকভাবে বহু লোকেই তা আধ্যাত্মিক বা যৌগিক শক্তির সহায়তা না নিয়েই সহজেই করতে পারে—এক সেট রেডিও বা টি, ভি'র সাহায্যে। এছাড়া এই সব অলৌকিকের ঝোঁক বা নেশা 'অকৃতবুদ্ধি' মানুষের দলকে এতই পাগল করে যে এতে সামাজিক বা নৈতিক চরিত্রসাধনার দিকটা একেবারেই চাপা পড়ে যায়। এবং সাধুসন্ত-গুরু-মহাপুরুষেরাও 'আমরা কি করব, লোকে এর অপব্যবহার করে' বলে রেহাই পেতে পারেন না। কারণ, তাঁরাই যখন নেতা তখন প্রকৃতধর্মজ্ঞানহীন শিষ্যদলকে তাঁরা ইচ্ছে থা লে অবশ্যই নিরস্ত করতে পারেন। আমরা জানি বিখ্যাত গুরুবাবাদের দল বাড়ানর ঝোঁক মাথায় চাপলে ধর্মান্ধ বা ধর্মপাগল শিষ্যের দল—দেশে একটা চিঠি লেখার চেন্ সৃষ্টি করেন, যার সারমর্ম হচ্ছে অমুক বাবার নাম করে বার বা পনের জনকে চিঠি লিখলে অশেষ মঙ্গল হাতেনাতে লাভ হবে। আর না লিখলে বা চেন্ ব্রেক করলে অশেষ অমঙ্গল ঘটবে। বলা বাহুল্য এর পরিণামে অমঙ্গল-ভীত হাজার হাজার মানুষের দল এভাবের চেন সৃষ্টি করে, দেশে বাবাদের নাম ছড়ায়। এরা সত্যিকার শিষ্য সাধকও নয় বলে আমরা মনে করি, অন্ত ভারতধর্মের বিচারে। এর ফলে বিশেষ বিশেষ বাবার মহিমা ঘোষিত হয় বটে কিন্তু তার মূলে থাকে ভয় ও অমঙ্গল থেকে মুক্তির পাগলামি। এই দুর্নীতির প্রসারে সাধুবাবাদের কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা সেই এক। তা হচ্ছে এই সব যৌগিক শক্তির ধর্ম সত্যিকার ভারতধর্ম নয়। বেদ-উপনিষদেও মন্ত্রযজ্ঞাদি দিয়ে প্রকৃতিকে কনট্রোল করার প্রবণতা থাকলেও—সেটা ছিল ধর্মের মধ্যেও

টা বৈজ্ঞানিক জীবনবাদ, লোকমাতানো তাকতুক বা অলৌকিক ধানোর প্রবণতা ঋষিদের মধ্যে ছিল না। এবং মানুষের মধ্যে বাস্তব বনেই আত্মিক স্বাধীনতা আনার জন্যে শৈশব থেকে সংযম-ব্রহ্মচর্য-সত্য-পন্থা-বীরত্ব-উত্তম-অধ্যবসায়-আত্মোৎসর্গ,—এইগুলিই ভারতের ঋষিরা পে ধাপে এবং বিভিন্ন সহজাতসংস্কার-সম্পন্ন মানুষের বিভিন্ন স্তরে স্তরে র্যকরী করে তুলতে সচেষ্ট থাকতেন। এ হলো শাশ্বত মনুষ্যত্বের সাধনা। তে গুরু-অবতার-সদ্‌গুরু-মহামানব ইত্যাদি নিয়ে ভাবের হল্লোড় করার বা সস্তায় কিছু ভাবভক্তি-জ্ঞানযুক্তি-যাগযোগ-পূজাহোম দিয়ে ঈশ্বর বা মোক্ষ লাভ করে নেবার অবাস্তব, অসম্যক্‌দর্শী, অসমাজচেতন ভাবালুতার স্কোপ ছিল না।

কোনও কোনও বিশিষ্ট যোগী বিশেষ রকমের যোগশক্তি দেখিয়ে বশেষ শিষ্যসাধককে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তির একটা জাগতিক স্তরে প্রকাশ তখন ঘটতে পারে। আসলে এগুলি যোগবিজ্ঞানের শক্তি, অলৌকিক কিছু নয়। কিন্তু এগুলির প্রকাশ স্বাভাবিক একমাত্র তিনটী ইচ্ছার যুগপৎ সমবায়ে। প্রথম—পরমাত্মার ইচ্ছা, দ্বিতীয়—যোগীর অন্তরাত্মার ইচ্ছা, তৃতীয় যে সাধককে দেখান হয় তার অন্তরের ইচ্ছা। একথা বলেছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী বাবা গম্ভীরানাথ তাঁর শক্তিধর শিষ্য স্বামী প্রণবানন্দের কাছে, অলৌকিক শক্তি দেখাবার সময়। এর বাইরে অলৌকিক শক্তি দেখালে তাঁদের দ্রুত পতিত হতে হয়, অথবা ব্যক্তি বা সমাজেরও ক্ষতি হতে পারে। ইন্টিগ্র্যাল যোগী শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর দেহরক্ষার পূর্বে কোনও কোনও ভক্ত প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তিনি যেন তাঁর রোগকষ্ট থেকে মুক্তির জন্য যোগশক্তি প্রয়োগ করেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তা করেননি,—বলেছিলেন, "তা' হয়না, তোমরা বুঝতে পারবেনা, বোঝাতে পারবো না।" সব প্রকৃত যোগীর ক্ষেত্রেই এই একই কথা। সুতরাং গুরু বা সদ্‌গুরুর অলৌকিক যোগশক্তি নিয়ে পাবলিক হল্লোড় সৃষ্টি করার কিছু নেই। পূজনীয় গুরুদেরও তা অনুমোদন বা উপেক্ষা করা উচিত নয়। আসলে জানতে হবে যে অনন্ত মহাশক্তির সমুদ্রে জগৎজীবন আন্দোলিত হচ্ছে তারই বড়-পাঝারি-ছোট দু'চারটে ঢেউ মাঝে-মাঝে আমাদের ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে পড়ে,—তখনি আমরা অলৌকিক মনে করি তাদেরকে। কিন্তু গুরু-মহাপুরুষ-মহামানবদের প্রকৃত যোগশক্তি দেখান হচ্ছে অনুগত শিষ্যদের এবং সমাজকে চরিত্রবলে বলীয়ান্ করে তুলে অনন্ত মহাসত্যের শাশ্বত ধারার সঙ্গে যুক্ত করা। এটাই প্রকৃত অলৌকিক কিন্তু এরও সার্থকতার জন্যে এযুগে ভাবপ্রবণ গুরুভক্তি, গুরুমাহাত্ম্য ঘোষণা, গুরুসম্প্রদায় বাড়ানো আসল কথা নয়। এর জন্যে চাই সমস্ত গুরুসম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে ("ঊর্দ্ধ-মধঃশাশ্বম্") যে শাশ্বত (নিত্যগতিশীল মহাসত্যের, বাস্তব জীবন-সত্যের, বা সমাজধর্মের স্রোত বয়ে চলেছে, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সেখানে মাথা নুইয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে, অর্থাৎ শৈশব থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত, এক স্বাভাবিক সত্যজীবনের সাধনার ধারা প্রবর্ত্তন করা। গুরু-সম্প্রদায় নিষ্ঠ হয়েও একাজ করা যায়। ভারতধর্মের মহাগৌরবের যুগে বহু মুনিঋষি, বহু বহু শিষ্যসমন্বিত হয়েও এই কেন্দ্রীয় মহাজীবনের বাস্তব মহামুক্তির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলতেন। মধ্যযুগ থেকে তা ম্লান হয়ে হারিয়ে যায়। তার স্থানে প্রধান হয়ে দেখা দেয় গুরু-সম্প্রদায়গত গুরু-মহিমার ধারা। এরই ফলশ্রুতি হয়েছে এই যে জীবনের সর্বস্তরে সর্বক্ষণ সর্বসাধারণের মধ্যে সত্যজীবনের বাস্তব মুক্তিসাধনা ও জীবনসার্থকতা আজ অবলুপ্ত। মুক্তি বা ভগবৎলাভ বা শান্তিলাভ এখন বাস্তবজীবনে পরিশ্রান্ত, বিভ্রান্ত বয়স্কদের ভাবপ্রবণ সাময়িক ভাবচরিতার্থতার পথ মাত্র। সমাজ ও গৃহপরিবার, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শিল্প ও সাহিত্য, অবসরবিনোদন ও আমোদ-আহ্লাদ সবই আজ শুষ্ক ফলদলের মতো অকালে ভূলুণ্ঠিত ও মধুগন্ধহীন। এর প্রতিকার আজ বিশ্বনিয়ন্তার মহাবিধানের অভিপ্রেত এবং তা হবেই। আর এরই জন্যে ভারতধর্মের ক্ষেত্রে আজ কোনও গুরু-মহাপুরুষ-সদ্‌গুরু-অবতার নিয়ে এবং তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে হৈ চৈ করার সময় নয়। এযুগের সমাজবাদী মনুষ্যত্বসাধনার প্রয়োজন এত বেশী যে ঐরূপ হৈ চৈ সমাজবিরোধী কাজও বলা যায়। আর সব সময়ে মনে রাখতে হবে —যা আমরা আগেই বলেছি যে এইসব আসলে কিন্তু ক্রিয়াকলাপ মহাসত্যের যুগমহাপ্রকাশের দৃষ্টিতে নগণ্য ব্যাপার মাত্র। এবং এই সব যোগশক্তির মহিমাঘোষণা আসলে ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রিয়তার পরোক্ষ পরিতৃপ্তি (indirect gratification) মাত্র। এযুগ চায় কোনও ব্যক্তির মহিমা নিয়ে মাতামাতি নয়, এযুগ চায় জাতির ও জনগণের চরিত্রমহিমার উদ্বোধন। অবশ্য এর জন্য মধ্যযুগের সাধনার দর্শনকেও পাল্টে দিয়ে মহা-সত্যের সাক্ষাৎ প্রেরণায় লব্ধ এক নূতন মৌলিক দর্শনের প্রচার-প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। পুরাতন জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-মুক্তি, পূজাপাঠ-সাধনভজন দান-ধ্যান-সেবাকার্য দিয়ে আজ আর কাজ হবেনা।

পরিশেষে আর একটা বলার কথা আছে। প্রচলিত অলৌকিকের নেশা ছাড়া আর এক রকমের একটা অভিজাত আলৌকিক নিয়ে মাতামাতিরও খুব চল আছে আমাদের দেশে। তা হচ্ছে বিদেশী সাহেবসুবোদের প্রশংসা নিয়ে হৈ চৈ। কোনও সাধুমহাত্মাকে নিয়ে কোনও সাহেব দু'দিন তাঁর বিদেশী চোখের রোমান্টিক দৃষ্টি নিয়ে কিছু লিখলেন, প্রাচ্য মিসটিসিজমের উদ্গাতা হয়ে উঠলেন, আর অমনি ঐ সাধুমহাত্মার অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে এ দেশে হৈ-হল্লোড় পড়ে গেল, যেন ঐ বিদেশী অ্যামেচার ধর্ম-জিজ্ঞাসু একজন ধর্মবিষয়ে অথরিটি। এ এক রকমের

নির্দ্দিষ্ট নিয়তি

—বনফুল

উচ্চতার শেষ বিন্দু নাইকো কোথাও,
কোনও সমাপ্তির রেখা পড়েনি তাহাতে।
আমরা, আরোহী দল,
উঠিতেছি, খালি উঠিতেছি।
ওঠাই মোদের লক্ষ্য,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে হয় পদস্খলন।
পড়িয়া আবার উঠি,
আবার চলিতে থাকি।
উচ্চতার আকর্ষণে এই চিরচলা।
আমাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়তি,
ইহার বিকল্প কিছু নাই।

আমি

—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আকাঙ্খার পাকে পাকে ঘোরান সিঁড়ির
অনেক অনেক ধাপ উঠে ত গেলাম,
তবু সে আলোয় দীপ্ত উজ্জ্বল শিখর
রয়ে গেল অনায়ত্ত।
রহস্য গভীর অন্ধকারে
প্রলম্বিত নৈরাশ্যের দড়ি ধরে নেমেও গেলাম,
তবু সে বিকারহীন নৈরাশ্যের মাটি
থাকল অতলস্পর্শ।
ঊর্দ্ধে অধে দুসীমায় অনন্ত বিস্তার,
মাঝখানে নিরুদ্ভব একটি জিজ্ঞাসা
একটি অস্থির স্থিতি...
তার নাম আমি।

(অলৌকিক ও ভারতধর্ম)

জাতীয় হীনম্মন্যতা যার মূলে রয়েছে জাতীয় চেতনার অনাত্মস্থতা। আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সতিকার বাস্তব রূপ না জানা পর্যন্ত এই অনাত্মস্থতা দূর হবে না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে ঋষিদের ধর্মের ঐতিহ্য এরূপ ছিল না। এক এক আধ্যাত্মিক সত্যনির্ণয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাগতিক জীবনকে আয়ত্ত করা এবং অমৃতকে লাভ করা ছিল তাঁদের প্রকৃতিগত লক্ষ্য। যজ্ঞাদির মধ্য দিয়ে বা জীবনসত্যের রহস্য-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে এই কাজে যদি অলৌকিক কিছু ছিল তা' ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়-গত সাধকের যোগবিভূতি দেখাবার কসরৎ নয়, পরন্তু এক জাতীয় সামগ্রিক সামাজিক জীবন পরিচালনার বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার রূপায়ণ। আত্মিক মুক্তি লাভও ছিল একটা সমাজ জীবনের ক্রমিক সাধনা,—ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের বা জ্ঞান-বিচার-প্রেম-ভক্তির বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের যোগচর্চ্চার বা অলৌকিক বিভূতি দেখাবার কোনও ঝোঁক নয়। এসব দেখা দেয় ভারত ধর্মের অধঃপতনের যুগে অর্থাৎ প্রায় গত হাজার বছরের মধ্যযুগে। তখন থেকে ধর্মের লক্ষ্যও হয়ে ওঠে দুঃখতপ্ত জীবনে কিছু সোয়াস্তির প্রলেপ বুলান। Satirist Aubrey Menon তাঁর "The New Mystics" গ্রন্থে ভারতীয় সাধুসন্ত সম্বন্ধে বলেছেন—"He knows a way of putting our mind rest without resorting to drink or drugs..." অর্থাৎ ভার রহস্যবাদী সাধু মদ বা নেশার ওষুধ প্রয়োগ না করেই আমাদের সোয়াস্তি দেবার একটা কৌশল জানেন...(Khushwant Singl কথাটার মধ্যে শ্লেষ থাকলেও একটা নির্জ্জলা সত্য রয়েছে,—তা ভারতীয় ধর্ম বর্ত্তমানে মানুষের পীড়িত মনে একটু আরাম দেবার চেষ্টা। আর কিছুই নয়। অবশ্য পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই বর্ত্তমানে এই পর্যায়ে তাদের নীতিবাদী ভাবুকতা সত্ত্বেও। কিন্তু সে যাই হোক এটা ভার নয়। ভারতে বর্ত্তমানে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক সমাজধর্মচেতনাবর্জি ধর্ম চলছে তার অনেক খানাই এই ব্যাপক অর্থে আর এক অলৌকি নেশা। মনে রাখতে হবে ভারতের মধ্যযুগীয় যোগসাধনায় 'ভূতি 'বিভূতি' অর্থে অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বা কামাবশায়িতা,—এই অষ্ট ঐশ্বর্য বা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাবার scope থা এগুলি সত্য জীবনের সমাজধর্ম্মের ধারক, পোষক, পালক, প্র মহাজীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতধর্ম নয়।

ায়ণ প্রসঙ্গ নিয়ে—

অসম্যক্‌দর্শী অকারণ হৈ-চৈ

া আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

ীয় আচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি আমাদের ছেন তার সারমর্ম্ম আমরা অনুবাদ করে দিলাম—

ামায়ণ-বিসম্বাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। আমি প্রথমে ও পরে কোলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে এবং পুনরায় লাইব্রেরীতে যে ভাষণগুলি দিয়েছিলাম সেগুলি রামায়ণের কতার কতকগুলি দিক্ সম্বন্ধে। সেখানে রামের সঙ্গে সীতার টেই কোনও গুরুত্বপূর্ণ অথবা বাস্তবসম্পর্কযুক্ত বিষয় ছিল না। গে থেকেই রামায়ণের কাহিনীর কয়েকটী অংশ নিয়ে কতকগুলি (Folk Tales) প্রচলিত ছিল, রবীন্দ্রনাথও সে কথা বলেছেন। াকে বৌদ্ধেরা ঐ জাতকে (দশরথ-জাতকে) স্থান দিয়েছিলেন। টেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী ছিল না। অন্যান্য বিষয়ও ঐভাবে ক। প্রকৃত ব্যাপার না-জেনে সমালোচনা করা এমনকি কখনও দ্ধ সমালোচনা করা নিয়ে আমি ভাবিত নই, আপনাকেও ভাবিত অনুরোধ করি। আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি তবে রামায়ণের ক দিক্ এবং রামায়ণ কাহিনীর ক্রমবিবর্তন নিয়ে একটা গ্রন্থ রতে মনস্থ করেছি"।

ষশ্রদ্ধেয় সুনীতিবাবুর স্থির বক্তব্য পরিষ্কার। আমরা এর খ্যা "শাশ্বত ভারতে" এ বিষয়ে লিখেছিলাম যে ভারতধর্মের চ্ছে বিবেকসম্মত, স্বাধীন ও ভাবপ্রবণতা-মুক্ত বাস্তব চিন্তা। নিজেকেই নানাভাবে যুগে যুগে ভেঙেছে ও নূতন করে গড়েছে। ভারতধর্ম "শাশ্বত" ও আজও জীবন্ত। সুতরাং সত্যনিষ্ঠ চারে ভারতধর্ম্ম নষ্ট হয় না, পুষ্টই হয়। এই সত্যটী বিস্মৃত হলে' সনাতনপন্থীরা ভারতধর্ম্মেরই ক্ষতিসাধন করবেন এবং তার াগী পুনর্জ্জাগরণের পথে বাধা সৃষ্টি করবেন।

বালীদ্বীপের হিন্দুর গৃহ

—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বালীদ্বীপের প্রধান সহর দেনপাসার একেবারে সমুদ্রের উপরে অবস্থিত নয়; সমুদ্রতীর থেকে দু' তিন মাইল দূরে। কিন্তু বালীদ্বীপের বিদেশী কায়দায় তৈরী বৃহত্তম হোটেল 'বীচ্ হোটেল' একেবারে সমুদ্রের উপরই অবস্থিত। হোটেল থেকে দেনপাসারে গাড়ী করে যাতায়াত করবার সব সময়ই সুবিধা আছে। এই হোটেলে বিদেশী পর্যটকদের ভীড়, সেখানকার আশেপাশের জীবন সবটুকুই বিদেশী কায়দায় গড়ে উঠেছে। হোটেলের কৃত্রিম স্নানসরোবর, তার টেনিস খেলার মাঠ, সমুদ্রের ধারে বসবার ব্যবস্থা সবই সেখানে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। 'বীচ্ হোটেল' আর তার চারপাশের জায়গাটুকু দেখলে মনে হবে যে তা ইউরোপ কিংবা মার্কিন দেশের যে কোনো সমুদ্রতীরবর্তী সহর। এমন কি, দেনপাসার সহরটির কিছু অংশের বাড়ীঘর দেখলে তা'কে একটি পাশ্চাত্য সহর বলেই মনে হ'তে পারে। কিন্তু দেনপাসার সহরের বারো আনা অংশেই বালীদ্বীপের বৈশিষ্ট্যের ছাপটুকুও স্পষ্ট হয়ে আছে।

P 3617E

দেনপাসার সহরটিও সহর হিসাবে নোতুন, তার পুরানো নাম বাহুঙ। রবীন্দ্রনাথ যখন বালীদ্বীপে গিয়েছিলেন, তা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, তখন বাহুঙ একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করবার পর থেকে সহরটি কেবল মাত্র একটি পর্যটক কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। এখন এই সহরটীই প্রকৃতপক্ষে যেমন পর্যটককেন্দ্র তেমনি সারা বালীদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র—এখান থেকেই বালীদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে গাড়ীতে করে যাতায়াত করা যায়। বালীদ্বীপে কোনো রেললাইন নেই; তারফলে দ্বীপের সৌন্দর্যটি অক্ষত আছে। রেললাইন থাকলে যাতায়াতের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু দেশের ভৌগোলিক রূপটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ার ফলে তার সৌন্দর্যের যে কত হানি হয় তা' এখানে না এলে বুঝতে পারা যায় না। দেনপাসার বালীদ্বীপের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে একটি উপদ্বীপের মত স্থানে অবস্থিত; সেখান থেকে উত্তরে, পূর্বে এবং পশ্চিমে চওড়াই-উৎরাই পার হয়ে গ্রামগুলোতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সে পথ কখনো অরণ্য, কখনো ছোটখাটো পর্বতের মধ্যে এবং গা বেয়ে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। দেনপাসারের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর. সেখান থেকে সমুদ্র তীর পর্যন্ত কোনো জনবসতি ছিল না, কিছুকাল যাবৎ কেবল মাত্র বিদেশী কায়দায় 'বীচ হোটেল'টি গড়ে উঠেছে।

দেনপাসার সহরটি নূতন হলেও বালীদ্বীপের স্থাপত্যশিল্পের ঐতিহ্য অনুযায়ীই নির্মিত হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

হ নির্মাণে বালীদ্বীপের একটি বিশেষত্ব এই যে সেখানকার সব বাড়ীঘরই
ারদিকে প্রাচীরঘেরা। এমন কোনো বাড়ী, সে যদি আপিস বাড়ীও হয়,
বু তার চারদিক ঘিরে একটি দেয়াল থাকবে এবং তা থাকতেই হবে,
গার ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। দেয়াল থাকবার একটি উদ্দেশ্যও
য়াছে। চারদিকে ঘেরা দেয়াল থাকলেই তার একটি ফটক বা সদর
রজা থাকতেই হবে। সম্পন্ন ব্যক্তিদের ফটকটি পাথরে তৈরী হয়ে
থাকে। এবং তার বাইরের দিকে নানা দৈত্যদানবভূতপ্রেতের মূর্তি
খোদাই করা থাকে। দৈত্যদানব ব্যতীতও দু'টি ভারতীয় পৌরাণিক
চরিত্রের মূর্তি প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়—একটি কুবেরের মূর্তি আর
একটি ভৈরবের মূর্তি, কুবের এবং ভৈরব দ্বারপালরূপে সদর দরজার দুপাশে
স্থাপিত থাকে। এখনও বালীদ্বীপের লোক তাদের বাসগৃহই হোক
কিংবা কর্মস্থানই হোক, তাকে পরম পবিত্র মন্দির বলে মনে করে এবং
মন্দিরের আদর্শ অনুযায়ীই তা নির্মাণ করে। বালীদ্বীপের সাধারণের
বাসগৃহ এবং দেবমন্দিরের নির্মাণপদ্ধতিতে কোনো পার্থক্য নেই—সেইজন্য
একটি গ্রামকে মন্দিরময় বলে মনে হয়। সহরের ও সম্পন্ন ব্যক্তির বাস-
ভবন থেকে সাধারণের বাসগৃহ নির্মাণেও এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা
হয়ে থাকে। এমন কি সরকারী গৃহ নির্মাণেও তার কোনো ব্যতিক্রম
হয় না।

ভারতে হিন্দুমন্দির নির্মাণের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যেমন মন্দিরের
ফটকে বা সদর দরজার দুই পাশে দ্বারপালরূপে কুবের কিংবা ভৈরবের
মূর্তি নির্মিত থাকে, বালীদ্বীপের, প্রত্যেক গৃহেরই (কেবল মাত্র মন্দিরের
নয়) সদর দরজায় এমনই দ্বারপালের মূর্তি খোদিত থাকে। রীতিটি
ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছে, কিন্তু সাধারণের গৃহনির্মাণে ভারতবর্ষে এই
রীতিটি পরিত্যক্ত হয়েছে, বালীদ্বীপে আজ পর্যন্ত তা রক্ষা পেয়ে চলেছে।
বালীদ্বীপবাসীর নিকট তাদের গৃহই মন্দির, গৃহের আঙ্গিনাই মন্দিরের
আঙ্গিনা, সেই মন্দিরের আঙ্গিনায় প্রত্যহ রাত্রে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে,
সেই নৃত্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ।

দেনপাসারের বড় বড় সরকারী ভবনগুলোও মন্দিরের আদর্শে নির্মিত
হ, অবশ্য মন্দির বলতে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলো যেমন উচ্চচূড়
এখানকার মন্দিরগুলো সেরকম নয়। প্রায় সবগৃহ এবং মন্দিরই কাঠ এবং
পাথর দিয়ে তৈরী; মন্দিরগুলোকে নেপালের কাঠে তৈরী মন্দিরের মত
মনে হয়। গৃহও সেই আদর্শেই তৈরী, প্রত্যেক বাড়ীর মধ্যেই এক একটি
মন্দির আছে বলে সেই মন্দিরের ফটকই বাড়ীর ফটক। প্রত্যেক
বাড়ীরই ফটকে ভূতপ্রেতদৈত্যদানবের যে মুখ খোদিত থাকে তার অর্থ
তাতে বাড়ীর কোনো শুভ দৃষ্টি পড়তে পারে না—কোনো অশুভ দৃষ্টি এই
ফটক পার হয়ে ভিতরে যেতে পারে না, বিকৃত আকৃতির ভূতপ্রেতের
মুখগুলো তাতে বাধা দেয়। এই বিশ্বাসটি যে ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছে
এমন কথা বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে ভারতের গ্রামাঞ্চ
সর্বত্রই এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এই বিশ্বাস একটি আদি
সুলভ বিশ্বাস; ভারতের ও আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে ত
ভাবেই প্রচলিত আছে। যবদ্বীপ কিংবা বালীদ্বীপের এই বিশ্বা
দেশের আদিম জাতির বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে
দ্বারপালরূপে কুবের এবং ভৈরবের যে মূর্তি দ্বারদেশে স্থাপন করা
রীতি যে ভারতীয় হিন্দুদের কাছ থেকেই সে দেশে গিয়েছে তা
করবার উপায় নেই। কারণ, কুবের এবং ভৈরব এঁরা হিন্দু
চরিত্র, বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থাদিতেও তাদের উল্লেখ আছে; তা
বৈদিক চরিত্র নয়। সুতরাং এ কথা মনে হতে পারে যে এরাও
আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাস থেকে একদিন উদ্ভূত হয়ে পৌরাণি
গিয়ে স্থান লাভ করেছিল।

বাসগৃহ বা বাস্তুগৃহকে যে নানা অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করব
প্রয়োজন আছে, তা ভারতীয় হিন্দুরা আজ আর সেভাবে ভ
বালীদ্বীপের হিন্দুরা মনে করে বহিরাগত অশুভ দৃষ্টির জন্য গৃহম
অপমৃত্যু ও নানা দুর্ঘটনা ঘটে। সেই জন্য চারদিকে দেয়াল
অলৌকিক উপায়ে সেই অশুভ দৃষ্টি থেকে গৃহকে তারা রক্ষা ক
দৃষ্টি কেবল মানুষের উপরই পড়ে না, গৃহস্থিত দেবমন্দিরে
আছেন তাঁর উপরও পড়ে।

সপ্তর্ষির জিজ্ঞাসা

—হিরণ্ময় বন্দ্যোপা

ঋগ্বেদে একটি বাণী আছে "কোহদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ।
আবভুব কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ"॥ (১০।১২৯।৬)। অর্থাৎ, 'কেই
জানে, কেই বা ঠিক বলবে, কোথা হতে এই সৃষ্টির উদ্ভব, কোথা
জন্মাল'; বিশ্ব জুড়ে চারিদিকে বিস্ময়ের ছড়াছড়ি। এই
সৃষ্টিপ্রবাহ চলেছে, আকাশে গ্রহতারকা মণ্ডল-আকারে ঘুরছে,
কোলে প্রাণের প্রবাহ চলেছে—এসব কোথা হতে এল? এ
মানুষের মনে যেদিন প্রথম ধীশক্তির বিকাশ হয়েছে সেদিন হতেই
ঋগ্বেদের উপরে উদ্ধৃত বাণীতে তারই আত্মপ্রকাশ পাই।

আমাদের বর্তমান কালের কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও এ
বোধ এবং কৌতূহলবোধের প্রতিধ্বনি পাই। তিনি বলেছেন:

"আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান"॥ (গীতি

সম্বন্ধে এই মহাবিস্ময় এবং তাকে ঘিরে যে মহাজিজ্ঞাসা তা মানুষের মনকে চিরদিন দোলা দিয়ে এসেছে। তা যেন নাশক্তির চূড়ান্ত পরীক্ষা হিসাবে মানুষের নিকট স্থাপিত ই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ বিজ্ঞানদর্শন গড়ে তুলেছে। র উত্তর দেবার উপযুক্ত ধীশক্তি সঞ্চয়ের জন্য বেদের যুগের ক্তির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে—'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' াদের ধীশক্তিমণ্ডিত করুন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখনও ষ হয়নি, অদম্য চেষ্টা চলেছে। মানুষকে তার উত্তর দিতে হবে। র মনে হয় এই কথা প্রতি রজনীতে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আকাশে ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলী আবর্তিত াশজোড়া মহাজিজ্ঞাসার চিহ্ন তা না হলে তাদের আকৃতিতে কেন? তা যেন মানুষকে বলে, বিশ্বকে ঘিরে যে রহস্য ছড়িয়ে রহস্য তুমি ভেদ কর দেখি? আরও মনে হয় সপ্তর্ষির নাম-ও যেন একটা তাৎপর্য আছে। এই সাতটি নক্ষত্র সাতটি ষ দ্বারা চিহ্নিত। অঙ্গিরা তাঁদের পিতা। তাঁরা যেন হ্ন-আকারে নিজেদের সাজিয়ে বলতে চান, আমরা যে প্রশ্ন াপী সাধনায় চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছাতে পারি নি, আমাদের আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পার কি না দেখ ত!

অতসী-পুষ্প-বর্ণাভা ॥

(মা দুর্গার গায়ের রং কি?)

—শ্রীসুখময় সরকার

্যানমন্ত্রে একটি শ্লোকার্ধ,

ী-পুষ্প-বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।" দেবী দুর্গার গাত্র তসীপুষ্পের আভাযুক্ত। অতসী পুষ্প চেনেন তো? —চিনি ঐ তো শনজাতীয় গাছে হলদে রঙের ফুল হয়; ফুলগুলোর পলাশ কিম্বা সজনের পর্যায়ে পড়ে—ওর নামই তো অতসী। কানও অঞ্চলে অতসীকে বলে 'বনশনা'—তাই না? তাহলে অতসীফুলের পীতবর্ণের সাদৃশ্যে দেবীকে "অতসী-পুষ্প-বর্ণাভা"রূপে করে ধ্যানমন্ত্রের রচয়িতা সঙ্গত কাজই করেছেন। পাঠান্তরে তাই "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা"। তপ্ত কাঞ্চন অবশ্য আরক্ত পীতবর্ণ। নিষদে দেবীকে "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীম্" ইত্যাদি মন্ত্রে য়েছে। এই উপনিষদে দেবী "অগ্নিবর্ণা"।

কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বর্ণনা করতে গিয়ে একজন বৈষ্ণব কবি বলছেন, "অতসীকুসুমশ্যাম।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদ্যুতি অতসী ফুলের মত শ্যামবর্ণ। আশ্চর্য। আমরা তো জানি অতসীফুল পীতবর্ণ। এ তবে কোন্ অতসী? বৈষ্ণব কবি তো ভুল করতে পারেন না। আচ্ছা দেখা যাক, সব চেয়ে প্রামাণিক সংস্কৃত অভিধান "অমরকোষ" কি বলে।

"অমর কোষে" লেখা আছে,—"অতসী স্যাৎ উমা ক্ষুমা।" অর্থাৎ অতসীর আরও দু'টী নাম আছে—উমা আর ক্ষুমা। ভারী কৌতুকজনক ব্যাপার। দুর্গারও এক নাম উমা। হিমালয়কন্যা পার্বতীর প্রিয় নাম উমা। তাহলে উমা আর অতসী সমার্থক—কিন্তু বস্তুটী কি? উমা এবং অতসীর এক নাম ক্ষুমা। ক্ষুমা থেকে উৎপন্ন বস্ত্রকে বলা হ'ত ক্ষৌমবস্ত্র। অনেকের ধারণা, ক্ষৌমবস্ত্র রেশমী কাপড়। কিন্তু তা নয়। তিসীর অংশু থেকে যে বস্ত্র তৈরী হয়, তারই নাম ক্ষৌমবস্ত্র। তিসীর কেবল তন্তু থেকে এককালে আমাদের দেশে অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র নির্মিত হত। শুধু তাই নয়। তিসীর তন্তু এত শক্ত যে অনেক পুরাণো হলেও 'টস্‌কে না।' সংস্কৃত ভাষায় 'নতস্যতে।' তাই এর নাম অতসী। তাহলে অতসী হল তিসী। ভাষা-বিজ্ঞানে এই ধ্বনি-বিকার স্বাভাবিক বলেই স্বীকৃতি লাভ করবে। 'অতসী' থেকে 'তসী'—আদিবর্ণ লোপের দৃষ্টান্ত। যেমন 'অলাবু' থেকে 'লাউ।' আবার 'তসী' থেকে 'তিসী'—স্বরসঙ্গতির উদাহরণ, যেমন—'মসা' থেকে মিসী (অনেকে শব্দটার উৎপত্তি না জেনে লেখে 'মিশি')। তিসীর এক নাম মসিনা। তিসীর বীজ অত্যন্ত মসৃণ, তাই 'মসৃণা' থেকে 'মসিনা' হয়েছে।

ক্ষৌম বস্ত্রের আর এক নাম ছিল 'দুকূল'। তিসী বা মসিনার অংশু ঈষৎ পীতবর্ণ, তাই দুকূলও হ'ত পীতবর্ণ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এ শ্রীকৃষ্ণ দুকূল পরিধান করেছেন। "মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।"

অতসীর অংশু পীতবর্ণ, কিন্তু অতসীর ফুলের রঙ্ কেমন? সকলেই দেখেছেন অতসী বা তিসী ফুলের রঙ্ নীল—নীল অপরাজিতার মতো। সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো। তাহ'লে তো বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণকে "অতসী-কুসুম-শ্যাম"-রূপে বর্ণনা করে ভুল করেন নি। দুর্গাও তাহলে অতসী পুষ্পের মতো নীলবর্ণা?

কিন্তু এ যে নতুন কথা।

নতুন কথা নয়, খুব পুরানো কথা। মৎস্যপুরাণে আছে একথা। মৎসপুরাণ রচিত হয়েছিল খ্রীঃ ২য় শতকে। অর্থাৎ, এখন থেকে ১৮০০ বছর আগের কথা। মৎস্যপুরাণে আছে, উমার যখন জন্ম হ'ল তখন তিনি ছিলেন উমা অর্থাৎ অতসীপুষ্পের মতো শ্যামবর্ণা। তারপর পঞ্চাগ্নি তপশ্চর্যা এবং শিবের ধ্যান করতে করতে তিনি হয়ে গেলেন 'গৌরী' অর্থাৎ

গৌরবর্ণা। এই মৎস্যপুরাণ থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করে মহাকবি কালিদাস রচনা করেছিলেন তাঁর অমর কাব্য "কুমারসম্ভবম্"। সে তো গুপ্তযুগের অর্থাৎ খ্রীঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতকের কথা।

কিন্তু দুর্গার "অতসীকুসুমশ্যাম" তনু কোনও শিল্পীর ধ্যানদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে কি? পড়েছে বৈ কি! আসানসোল গিয়ে হটন রোডে গেলেই দেখতে পাবেন—অতসীকুসুমের মতো শ্যামবর্ণা দুর্গাপ্রতিমা। খোঁজ করলে আরও হয়তো পাওয়া যাবে।

প্রথমে যিনি ছিলেন অতসীপুষ্পবর্ণাভা, তিনিই তপস্যার প্রভাবে হলেন গৌরী। কৃষ্ণবর্ণ বা শ্যামবর্ণ তমোগুণের প্রতীক, আর গৌর এবং শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণের দ্যোতক। তপস্যার দ্বারা তমোগুণেরও সত্ত্বগুণে উন্নীত করা সম্ভবপর,—এই তত্ত্বই বিধৃত আছে মৎস্যপুরাণের পর্বতকন্যা উমার উপাখ্যানে। উপনিষদে হৈমবতী উমা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। মূর্তিময়ী তপস্যা। জগন্মাতার অতসীকুসুমশ্যাম তনু কেমন করে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ হলো সেই পুণ্যগাথা স্মরণ-মনন করে আমাদেরও হৃদয়ের তামসিকতা দূর হোক, আমাদের চেতনার প্রতিষ্ঠা হোক শাশ্বত সাত্ত্বিকভাবে।

ঐশী কৃপাপ্রেরণা-পরিচালিত

"শাশ্বত ভারত"-এর

নিত্যনূতন অভিনন্দন !!

"শাশ্বত ভারত" আগ্রহ সহকারে পাঠ করি। তার যে একটি বিশেষ আদর্শ আছে, যা যুক্তিবাদী মন নিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পথে পরিচালিত করতে চায়, তা লক্ষ্য করেছি। **সম্প্রতি সরকারের নীতির গঠনমূলক আলোচনা প্রবর্তন করেছেন, তাও লক্ষ্য করেছি। সাংবাদিকতায় এই আদর্শ স্থাপনের প্রয়োজন ছিল।**

—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রখ্যাত দার্শনিক-সাহিত্যিক ও প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস)

আপনার পত্রিকার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এই সমস্ত গণ্ডীঘেরা অচলায়তন, এই সমস্ত কুক্ষিগত চিন্তার আবেষ্টনী ভেঙে নতুন একটা সর্বাঙ্গীন ও সার্বজনীন মানসলোক আপনি রচনা করায় আত্মনিমগ্ন হয়েছেন। পত্রিকাটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায় যে **যুগোপযোগী এক মহৎ ঐশী চেতনা আপনার শুচিশুভ্র আধারে এখন নিরন্তর ক্রিয়াশীল কেননা সর্বশক্তিমানের আশীর্ব্বাদ, আদেশ বা নির্দে এভাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।**

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপ

(সাধক-সাহিত্যিক, আশুতোষ সাহিত্য ভবন ২৪ প

আপনার পত্রিকা যথানিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকান এবং পড়েছি এবং আনন্দ পেয়েছি। **এটি উদ্দেশ্যহীন ব্যং উদ্যোগ নয়, আদর্শ প্রচারের কল্পে সুনির্মিত,** পত্রিকায় প্রতি ছত্রেই পরিস্ফুট। **এমন উদ্‌যোগ অন্যত্র দেখিনি।** আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

—শ্রীদিরাম

(ডি. লিট., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রধান, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক)

আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি তবে আত্মিক যো বোধ করি। **ধর্মের নামে অনেক গোঁজামিল, বুজ হাবিজাবী আমরা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য আপনার বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও সতেজ কলম ধর্মকে সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট।** ভেজাল বা আমাদের মনে। **এই সময় সত্যকে, আদর্শকে তুলে ধরতে যে সাহসের দরকার তা আপনাকে দিয়েছেন।**

—শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপা

(অভেদানন্দ বিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম)

"শাশ্বত ভারত" পাইয়াছি। **যতই পড়িতেছি, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেছি, ততই নূতন নূতন সন্ধান পাইতেছি।**

—সুখময় সর

(ভারতীয় সংস্কৃতিবিদ্ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লেখক-শিক্ষাব্রতী

দিনের পর দিন আপনার লেখা ও চিন্তাধারা আমাকে কবিতেছে।.....আপনার June-July সংখ্যা সত্যসত্যই এ আলো ও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, বিশেষ করিয়া intellect মধ্যে। **ইহা নিশ্চিত যে আপনার চিন্তধারা অতিসুন্দর নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিতেছে য "অকাট্য" যুক্তি দ্বারাও খণ্ডন করা যায় না।**

—শ্রীভবরঞ্জন

(বিশিষ্ট দেশসেবক-সমাজনেতা, আসানসোল)

প্রাপ্তিস্থান—"শাশ্বত ভারত" কার্যালয়, বাঁকুড়া। শ্রীমুরলীধর সরকার কর্তৃক বাঁকুড়া এ টু জেড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক মহাসত বাঁকুড়া হইতে প্রকাশিত। Printed by Sri M. D. Sarkar (Editor—Publisher) at the A to Z Printing Works, Bankura (W.